প্রত্যাশা • একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক • বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১১ • ৪

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- আল কুরআনের আলোকে মানুষ
  মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার
- মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব
  সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া
- পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিচয়, মর্যাদা ও আনুগত্য
  মো. আশিফুর রহমান
- সিবতে আকবার : ইমাম হাসান (আ.)
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- যুগের ইমাম সংক্রান্ত হাদীসের ওপর একটি পর্যালোচনা
  মোহাম্মদ মুনীর হোসেইন খান
- আপনার জিজ্ঞাসা
- মানুষের সারবত্তা : অস্তিত্ববাদের মূল প্রেক্ষিত– একটি সাদরায়ী অনুসন্ধান
  আলী রেযা রওগনি মোভাফ্ফাক

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪

জানুয়ারি-মার্চ ২০১১

সম্পাদক : **এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : মাঘ-চৈত্র ১৪১৭ বাং

সফর-রবিউস সানী ১৪৩২ হি.

জানুয়ারি-মার্চ ২০১১ ইং

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : ২৯৯, গাউসুল আযম মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

ই-মেইল : prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 1, No. 4, January-March, 2011), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 299, Gausul Azam Market, Nilkhet, Dhaka-1205; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

আল কুরআনের আলোকে মানুষ ৭

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব ১৭

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিচয়, মর্যাদা ও আনুগত্য ২৭

মো. আশিফুর রহমান

সিবতে আকবার : ইমাম হাসান (আ.) ৬১

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

যুগের ইমাম সংক্রান্ত হাদীসের ওপর একটি পর্যালোচনা ৮২

মোহাম্মদ মুনীর হোসেইন খান

আপনার জিজ্ঞাসা ৯৫

মানুষের সারবত্তা : অস্তিত্ববাদের মূল প্রেক্ষিত–
একটি সাদরায়ী অনুসন্ধান ১০৭

আলী রেযা রওগনি মোভাফ্ফাক

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 1, No. 4, January-March, 2011

Table of Contents

Editorial 5

Man in the Light of the Holy Quran 7
Mohammad Zawad Rudgar

Divine Representation of Human Being 17
Sayyed Akbar Sayyedinia

Recognition, Dignity and Obedience of Hazrat Muhammad (Sm.) in the Holy Quran 27
Md. Asifur Rahman

Short Biography of Imam Hasan (As.) 61
Abdul Quddus Badsha

A Review on the Hadith of Imam of the Era 82
Mohammad Munir Hossain Khan

Your Questions 95

Essence of Human Being : Perspective of Existentialism : A Quest in the line of (Molla) Sadra 107
Ali Reza Rougani Movaffaq

গ্রাহক চাঁদার হার		
	প্রতি কপি	বাৎসরিক
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা	২৪০ টাকা

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

অন্যায়-অবিচার, ঐশীরীতি ও মানব প্রকৃতির পরিপন্থী

ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। জুলুম ও অবিচার সকল অবস্থায় নিন্দনীয়– তা ব্যক্তি পর্যায়েই হোক বা সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হোক বা জন্মগত স্বাধীনতার কোন বিষয়ে। তাই জুলুমের উচ্ছেদ মানুষের নিরন্তন এক কামনা। মানব ইতিহাসে সকল যুগেই একদল ব্যক্তিকে জালিম হিসেবে আবির্ভূত হতে দেখা গিয়েছে যারা স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সা, পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির মোহ, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, প্রতিহিংসা, স্বজাতি ও গোত্রের প্রতি অন্ধ ভালবাসা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে অন্যের অধিকার হরণ করেছে। কখনও কখনও তারা এ কারণে অসংখ্য মানুষের জীবন বিপন্ন করেছে। বর্তমানেও পৃথিবীতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেরূপ সবসময় এমন গোষ্ঠী ছিল যারা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করত এবং এ ধারণা রাখত যে, তারা প্রভুত্ব করার জন্য পৃথিবীতে এসেছে এবং অন্যরা তাদের সেবাদাস হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে; এখনও একদল মানুষ সেরূপ ধারণা পোষণ করে। বিষয়টি যখন একটি জাতির মধ্যে দেখা দেয় তখন তা তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চিন্তার সৃষ্টি করে, আর যদি তা কোন জাতির বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় তখন একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার ও রাজতন্ত্রের জন্ম দেয়। বর্তমানে এ দু'টি ধারাই পৃথিবীর মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনার সবচেয়ে বড় কারণ। এ অবস্থা কোন সত্যপন্থী, ন্যায়পরায়ণ, আত্মত্যাগী ও মানবপ্রেমী মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এ বিষয়গুলো তার সহজাত মানব প্রকৃতির বিরোধী। তাই এ ধরনের প্রথা ও কাঠামোর বিরুদ্ধে মানুষ চিরকাল সোচ্চার থেকেছে। বিগত কয়েক শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনগুলো এ সত্যকেই তুলে ধরে। গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাসীন একনায়কদের পতনের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও বিপ্লবের কারণও মানুষের স্বাধীনতাকামী ও অন্যায় প্রতিরোধী মনোভাবের মধ্যে নিহিত। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি আরব-বিশ্ব তথা মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোতে একনায়ক শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে। কেউ কেউ এ ধরনের গণরোষ ও ক্ষোভের একমাত্র কারণ ঐ সকল দেশের মানুষের অর্থনৈতিক বঞ্চনা বলেছেন। কিন্তু একনায়ক শাসকদের বিরুদ্ধে এ সকল দেশের মানুষের আন্দোলনকে একশ' ভাগ

অর্থনৈতিক বঞ্চনাপ্রসূত বলা যায় না। কারণ, যদিও মিশর ও ইয়েমেনের মত কিছু দেশে অর্থনৈতিক সমস্যার বিষয়টি মানুষকে ময়দানে আনতে অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ করেছে বলা যায়, কিন্তু বাহরাইন বা লিবিয়ার মত দেশগুলোতে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটা খারাপ নয় যে, তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নেবে; বরং বলা যেতে পারে, তারা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিয়েই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। মানুষের জন্মগত এ অধিকারকে পবিত্র কুরআন স্বীকৃতি দিয়ে বলেছে : 'তোমরা (অপরের ওপর) জুলুম করবে না এবং অবিচারের শিকার হবে না।' (সূরা বাকারা : ২৭৯)। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেছেন : 'আল্লাহ্ উচ্চৈঃস্বরে মন্দ কথার প্রকাশকে পছন্দ করেন না, তবে তার জন্য ব্যতীত যার ওপর অবিচার করা হয়েছে।' (সূরা নিসা : ১৪৮)। অপর এক আয়াতে অন্যায় আচরণ ও অধিকার হরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে সাহায্য কামনাকে অনুমোদন দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : 'যদি কেউ নির্যাতিত হওয়ার পর তা প্রতিরোধের জন্য সাহায্য চায়, তার ওপর কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের ওপর যারা মানুষের ওপর অবিচার করে এবং অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে। বস্তুত তাদের জন্যই রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।' (সূরা শুরা : ৪১-৪২)

এ সকল আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলাম অন্যায় ও জুলুম মেনে নেওয়াকে নিন্দনীয় মনে করে এবং জালেম, স্বৈরাচারী ও অধিকার হরণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে বৈধ গণ্য করে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতিই সম্মান ও মর্যাদার পবিত্র স্থানে পৌঁছতে পারে না যতক্ষণ না তাদের দুর্বলরা কোনরূপ দ্বিধা ও সংকোচ ছাড়া তাদের শক্তিমানদের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করে।'

পবিত্র কুরআন ফিরআউন, নমরূদ ও তাদের ন্যায় যেসব ব্যক্তি মানুষের অধিকারসমূহ পদদলিত করত তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা মানবজাতিকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এজন্য যে, কেউ যেন পৃথিবীতে অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পথ অবলম্বন করে বিপর্যয় সৃষ্টি না করে। কারণ, বিশ্ব ঐশী এক রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা জুলুম ও অন্যায়কে বরদাশ্ত করে না। হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'পৃথিবী আল্লাহ্কে অস্বীকার করে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু অন্যায় ও অবিচারের মধ্যে টিকে থাকতে পারে না।'

তাই মানুষের উচিত সকল প্রকার জুলুম পরিহার করা এবং স্বজাতির বৈধ অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও সোচ্চার হওয়া। আর সেসাথে উচিত সকল নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানো। এটিই মনুষ্যত্বের দাবি।

আল কুরআনের আলোকে মানুষ

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম

কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের শিক্ষার অনুবর্তী হয়ে সঠিক ধারায় আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হয় যাতে সত্যপ্রেম ও পুণ্যকর্মের সমন্বয় ঘটেছে। এ আধ্যাত্মিকতায় মানুষ তার জীবনের পরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করে। এ জ্ঞান অর্জন কখনও থেমে থাকে না; বরং ধারণাগতভাবে যেমন এ জ্ঞান গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, তেমনি আত্মনির্ভর জ্ঞানের (علم حضوری) মাধ্যমেও স্রষ্টার অস্তিত্বকে বাস্তবরূপে নিজের মধ্যে ও সৃষ্টিজগতে প্রত্যক্ষ করে। এভাবে স্রষ্টা পরিচিতির পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার গভীরতা ও ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ্-পরিচিতি ও তাঁর প্রতি ভালবাসার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই এ দু' ক্ষেত্রে সকল সময় ও অবস্থায় গতিশীলতা, উন্নতি, আধিক্য ও ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

والذين آمنوا اشدوا حبا لله

'যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার ক্ষেত্রে প্রকটতম।'

---

*ইরানের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস তাঁর (সম্পর্কে জ্ঞান) পরিচিতি ও ভালবাসা থেকে উৎসারিত, বিকশিত ও ফলবান হয় সেহেতু এ আয়াতে আধিক্যের কথা বলা হয়নি; বরং প্রকটতার কথা বলা হয়েছে এবং তার সঙ্গে ঈমান ও বিশ্বাসের সম্পর্কের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত যদি সূরা মূল্‌ক-এর এ আয়াতের পাশে রাখা হয়,

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম', তবে দেখা যাবে এখানেও কর্মের আধিক্যের কথা বলা হয়নি, কর্মের অধিকতর উত্তম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ আমল ও কর্মের গুণগত মানের কথা বলা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, এ আয়াত দু'টি থেকে বোঝা যায়, একদিকে ঈমানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের মধ্যে মর্যাদা ও পর্যায়গত পার্থক্য রয়েছে, অন্যদিকে বিশ্বাস ও কর্মের সঙ্গে বিশ্বাসী ব্যক্তির সত্তা ও অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এ অর্থে যে, ঈমানের তীব্রতা ও গভীরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বাসী ব্যক্তির অস্তিত্বগত উৎকর্ষের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে একই কর্ম উচ্চতর পর্যায়ের ঈমানের ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া তার থেকে নিম্ন পর্যায়ের ঈমানের ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া অপেক্ষা গুণগতভাবে অধিক মর্যাদার অধিকারী। তাই পবিত্র কুরআনে এ দু'পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। নিম্নতর পর্যায়ের বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- لهم درجات عند ربهم অর্থাৎ তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে,[১] অথচ উচ্চতর পর্যায়ের বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে- هم درجات عند الله 'তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাবান।'[২] প্রথম ক্ষেত্রে মর্যাদার বিষয়টি তাদের অস্তিত্বের অংশে পরিণত হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মর্যাদার বিষয়টি তাদের সত্তাগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ তারা নিজেরাই মর্যাদাবান অস্তিত্ব।

সুতরাং আমরা এ বিষয় থেকে বুঝতে পারি যে, সঠিক ধারার আধ্যাত্মিকতা আল্লাহ্‌-পরিচিতির ক্ষেত্রে গভীরতা দান ও এর গতিকে ত্বরান্বিত করা, ঈমানের পূর্ণতা, আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসাকে দৃঢ়তা দান এবং সৎ কর্মের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা সৃষ্টিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে! প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ঐশী পথের পথিককে পূর্ণতা অর্জনে চরম উদ্দীপনা দান করে এবং তাকে আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রা ও অস্তিত্বগতভাবে তার নৈকট্য লাভের[৩] ক্ষেত্রে পথনির্দেশনা দান করে। এমনকি ব্যবহারিকভাবেও তাকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর

মনোনীত স্থলাভিষিক্ত নিষ্পাপ ইমামগণের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর মনোনীত স্থলাভিষিক্ত নিষ্পাপ ইমামগণের পরিচিতি লাভ, তাঁদের প্রতি ভালবাসা ও তাঁদের নির্দেশিত পথে চলার মাধ্যমে ঐশী মানবীয় প্রকৃতির (ফিতরাতের) বিকাশ ঘটায় এবং ঐশী প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা লাভ করে।

আল্লাহ্‌র ভালবাসার পাত্রে পরিণত হতে পবিত্র কুরআন এ ধারাকেই গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের ভাষায় :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ...

'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে আমার (আল্লাহ্‌র নবী) অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল গুনাহ (অপরাধ ও ত্রুটি) ক্ষমা করবেন...।'[৪]

তাই আল্লাহ্‌র নবীকে অনুসরণের মাধ্যমেই দ্বিপাক্ষিক এ ভালবাসা বাস্তবরূপ লাভ করে। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কটি বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে যে সকল পূর্ণ মানব ও নিষ্পাপ ব্যক্তি মনোনীত হন তাঁদের সচেতন ও উদ্দীপ্ত অনুসরণ ও ভালবাসার মাধ্যমে তা অব্যাহত থাকে। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও সাক্ষাৎ লাভের একমাত্র পথ যে এটিই তা আল্লাহ্‌ এ আয়াতে বলেছেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর (এই) রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে নির্দেশের অধিকর্তাদের (উলিল আমরের)।' আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের পাশাপাশি এ নির্দেশের অধিকর্তাদের আনুগত্যের অপরিহার্যতা থেকে (তাঁদের নিষ্পাপত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয় এবং) বোঝা যায়, এটিই একমাত্র সিরাতে মুস্তাকিম অর্থাৎ সঠিক সরল পথ।

অন্যদিকে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আল্লাহ্‌, রাসূল ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধিদের বন্ধু ও অনুসারীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন এবং তাঁদের শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও তাদের বিরুদ্ধে কঠোর যা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সোপান। মহান আল্লাহ্‌ রাসূল (সা.)-এর সাথীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন : 'তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের অধিকারী'[৫] এবং মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন : 'তুমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন দল পাবে না যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের ভালবাসবে যদিও

তারা তাদের পিতৃপুরুষ অথবা সন্তান-সন্ততি অথবা তাদের ভ্রাতৃবৃন্দ অথবা তাদের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরাই সে সকল লোক, তিনি (আল্লাহ্) যাদের অন্তরে ঈমান অঙ্কিত করে দিয়েছেন।'[৬]

সুতরাং কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার অধিকারী, তার পদক্ষেপসমূহ যৌক্তিক, তার উদ্দীপনার নিয়ামক হল ভালবাসা এবং তার প্রতিক্রিয়াসমূহ সুপরিকল্পিত রীতিবদ্ধ। সে তার জীবনে যে মৌলনীতির অনুসরণ করে তা বস্তুগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় না অর্থাৎ তার জীবনের মূল লক্ষ্য জৈবিক ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ নয়; বরং সে তার সত্তা ও কর্মে পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেকে মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মনোনীত ব্যক্তিদের অভিভাবকত্বে সোপর্দ করে। সে সর্বাবস্থায় তার চিন্তা, কর্ম এবং বিশ্ব ও সমাজের কর্মকাণ্ডের মোকাবিলায় স্রষ্টার নিকট জবাবদিহিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। ফলে সকল ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা ও পদক্ষেপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে যাতে কখনই তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়ে। একদিকে সে স্রষ্টার উপাসনার দায়িত্ব পরম ভালবাসা দিয়ে পালন করে, অন্যদিকে স্রষ্টার ভালবাসার দাবিতে সৃষ্টির প্রতিও ভালবাসা পোষণ করে। তাই সে সৃষ্টির সেবায় নিজেকে রত করে, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনকে নিজ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে, বিশেষত মুসলমানদের সার্বিক উন্নতির কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত ভূমিকা পালন করে। এভাবে সে কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতার আলোকে মানুষকে সত্যের দিকে পরিচালিত করার মাধ্যমে আদর্শ ঐশী সমাজ গঠনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি এক্ষেত্রে সে সম্পদ, জীবন ও সম্মানকে আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করে। কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ এ শিক্ষা লাভ করেছে যে, আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার অন্যতম প্রকাশ হল তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা। এ ভালবাসার দাবি হল সমাজের বস্তুগত ও নৈতিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সে নিজেকে কষ্টে ফেলবে। যেহেতু সকল সমাজেই এমন একদল লোক রয়েছে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যদেরকে নিজেদের সেবাদাসে পরিণত করে এবং তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করে তাদের বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেহেতু কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ স্বাধীনতা, পূর্ণতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সৌভাগ্যের শত্রু এ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয় এবং সকল অবস্থায় এ পথে দৃঢ় থাকে। এমন ব্যক্তির পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন : 'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক হলেন আল্লাহ্, অতঃপর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে,

তাদের ওপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), তোমরা ভয় কর না এবং দুঃখিত হয়ো না এবং সেই বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে।[৭]

জ্ঞানপিপাসা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি

কুরআনের আদর্শ মানুষ এমনভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছে যে, সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণতার দিকে যাত্রাশীল। সে তার শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় রত। এক্ষেত্রে তার উন্নতি ও সাফল্য তাকে অন্যদের ঈর্ষার পাত্র করে। তাদের প্রতিটি দিন পূর্বের দিন হতে উত্তম এবং সর্বদা সে সামনের দিকে অগ্রসরমান। কোন কিছুই তাকে পশ্চাদমুখী ও স্থবির করে না। ফলে সে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত সত্তা নয়; বরং গতিশীল ও অর্জনকারী এক সত্তা। যে মানুষ কুরআনের আলোয় আলোকিত হতে চায় তার পক্ষে সমীচীন নয় যে, সে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞানের কাফেলা থেকে পিছিয়ে পড়বে; বরং এমন মানুষ জ্ঞানকে মূর্খতার ওপর, অমুখাপেক্ষিতাকে মুখাপেক্ষিতার ওপর এবং অর্জনকে বঞ্চনার ওপর প্রাধান্য দেবে এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণতাকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে। সে জানে জ্ঞানের কোন্ শীর্ষ চূড়াগুলো অবিজিত এবং কোন্ শাখাগুলো অজানা রয়েছে। সে আরও জানে, জ্ঞানের কোন্ দিকগুলো অধিক বিস্ময়কর এবং সৃষ্টিজগতের কোন্ অস্তিত্বের মধ্যে অসীম পর্যন্ত জ্ঞানের ধারা অব্যাহত রয়েছে– যার ধাপগুলো একের পর এক উত্তরণের মাধ্যমে সেসবের রহস্যগুলো উন্মোচন করতে হবে। সে এ রহস্যের দ্বারসমূহ উন্মোচনের মাধ্যমে সৃষ্টির বিশালতা ও স্রষ্টার অসীমতার গভীরতর ধারণায় পৌঁছায়। কুরআনে বর্ণিত আদর্শ মানুষ এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছে যে, জ্ঞানই স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিকট মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। তবে সেই জ্ঞানই সঠিক ও মানুষকে মর্যাদা দান করে যে জ্ঞান কল্যাণকর এবং মানুষকে সৎকর্মে উদ্দীপ্ত ও প্রবৃত্ত করে। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন।'[৮]

কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকৃত মানুষ উত্তমরূপে জানে যে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয় জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়; বরং পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম। তাই সে এ

দুইয়ের মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষ ও অর্জিত– উভয় জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। এরূপ মানুষ চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জনযোগ্য জ্ঞান রপ্ত করে, তেমনি আত্মসংযম ও আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে দিব্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। শব্দ ও বাক্য থেকে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যেমন এর অন্তর্নিহিত অর্থে পৌঁছায়, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে সকল বস্তু ও অস্তিত্বের বাস্তব রূপ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে। একদিকে সে বাহ্যিক ধারণার জ্ঞানকে অবধারণ (شهود) করে, অপরদিকে সকল কিছুর অভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থা তার দিব্যদৃষ্টিতে ধরা দেয়। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে তাকে শিক্ষা দান করেন এবং সে সত্য ও অসত্যকে চেনা ও বোঝার ক্ষমতা লাভ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন : 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দেবেন।'[৯] তিনি অন্যত্র বলেছেন : '...যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে তিনি তোমাদের (সত্য-মিথ্যার) প্রভেদকারী উপকরণ দান করবেন...।'[১০]

এমন ব্যক্তি স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় রত। সে যেমন তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি সৎকর্মকে তার মুক্তি ও পূর্ণতার পাথেয় করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেছেন : 'তবে যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সিজদা করে ও দণ্ডায়মান হয়ে পরম আনুগত্য প্রকাশ করে এবং পরকালকে ভয় করে এ অবস্থায় যে, সে তার প্রতিপালকের রহমতের আশা করে, সে কি তার ন্যায় (যে তার প্রতিপালকের অবাধ্য)? তুমি বল : যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? বস্তুত কেবল বোধসম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ (ও শিক্ষা) গ্রহণ করে।'[১১]

আলোচ্য আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশ আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও বাতেনী জ্ঞান অর্জন ও উৎকর্ষ লাভের প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং মধ্যবর্তী অংশ সার্বিকভাবে সকল প্রকার (কল্যাণমুখী) জ্ঞান যে মানুষের জন্য মর্যাদা বয়ে আনে, তার প্রতি ইশারা করছে। এ জ্ঞানের মধ্যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বিদ্যমান সকল কিছুর জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে এ সকল প্রকার জ্ঞানের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। মহাকাশ, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতিসহ বস্তুগত ও পার্থিব কল্যাণের সহায়ক সকল জ্ঞানকে যেমন শামিল করে, তেমনি আধ্যাত্মিক এবং বস্তুর ঊর্ধ্বে বিশ্বজগতের পরিচালনা ব্যবস্থা

সম্পর্কিত জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ ইসলামী সমাজকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য সমাজের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞান অন্বেষণে রত হয় এবং এ সমাজের জন্য সম্মানজনক ও মর্যাদাকর অবস্থান তৈরির ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। সে সবসময় সতর্ক থাকে যাতে সমাজের বস্তুগত উন্নয়ন এর অধিবাসীদের ভোগবাদিতার দিকে পরিচালিত না করে। একই সাথে সে শত্রুর বিবিধ আগ্রাসন (সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক) থেকে এ সমাজকে রক্ষার চেষ্টায় ব্রত থাকে। সুতরাং কুরআনভিত্তিক সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-প্রযুক্তি, সংস্কৃতি কোন ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ ও পরনির্ভর থাকতে পারে না। কখনই তা সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির সামনে নতজানু হয় না এবং তাদের তিরস্কারকে গ্রাহ্য করে না।

কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ জ্ঞানের প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। জ্ঞানগত বিষয় ও আলোচনাই তার জীবনের লক্ষণীয় বিষয়। এটি সেই জ্ঞান যা অর্জন করাকে মহানবী (সা.) সকল মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরয (আবশ্যক) বলেছেন। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধনাকারীদের আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত, এ পথে প্রচেষ্টারত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে শহীদ, পরিশুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিদের আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁর নিকট সুপারিশকারী এবং তাঁদের কলমের কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র বলেছেন। এরূপ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চিন্তাগত ভিত্তির ওপর বেড়ে ওঠা মানুষ মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান অন্বেষণ থেকে বিরত থাকতে পারে না।

সুতরাং কুরআনের আদর্শ মানুষ জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র ইবাদাত, ঈমান ও ধার্মিকতার সঙ্গী এবং পরিপূরক হিসেবে দেখে; তার জ্ঞান তাকে বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। তাই তার মধ্যে জ্ঞান ও আত্মসংযম, চিন্তা ও আত্মিক পরিশুদ্ধি, ঐশী নির্দেশের প্রতি আত্মসমর্পণ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে পূর্ণরূপে ব্যবহার– এ সবের সমন্বয় ঘটেছে। কুরআনই একদিকে তাকে জ্ঞানের দিকে ধাবিত করেছে এবং কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, অজ্ঞতা ও চিন্তাগত বিচ্যুতি থেকে মুক্তি লাভের পথ দেখিয়েছে, অন্যদিকে তাকে ধর্মবিরোধিতা থেকে মুক্তি দানের মাধ্যমে নৈতিক অধঃপতন, বিচ্যুতি, অমানবিক আচরণ, হিংস্রতা, সহিংসতা, শোষণ, অন্যায়-অবিচার, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ থেকে দূরে রেখেছে। কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ কখনই উগ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও জ্ঞানশূন্য হতে পারে না। কারণ, কুরআন জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা, খোদাপ্রেম, মানবপ্রেম, খোদা উপাসনা, চিন্তা ও সার্বিক উন্নয়ন, স্বাধীনতা

(প্রবৃত্তির কামনা ও বহিঃশক্তির আগ্রাসন থেকে মুক্তি), বুদ্ধিবৃত্তি, সত্যমুখিতা, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ মানুষের সৌভাগ্য ও পূর্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে সমন্বিত করেছে। তাই কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক ও অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ দিব্যজ্ঞানকে নিজের মধ্যে একত্র করেছে। সে শুধু পথের সন্ধানই পায়নি; বরং গন্তব্যের দিকে যথার্থভাবে এগিয়ে চলেছে। আর এ কাজ তার জন্য তখনই সম্ভবপর হয়েছে যখন সে ঐশী পথ প্রদর্শকদের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করেছে এবং নিজেকে আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা হিসেবে সমর্পণ করেছে। এরূপ মানুষের অস্তিত্বের সকল দিক পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার ঐশী সহজাত প্রবৃত্তির সাথে সংগতিশীল। যেহেতু কুরআনের 'মানব-পরিচিতি' সার্বিক ও পূর্ণ হিসেবে অনুপম ও অদ্বিতীয় এবং যুক্তির ভিত্তিতে সুদৃঢ়, সেহেতু কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষও আত্মগঠন, পূর্ণতা ও সার্বিকতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। সে তার বিশ্বদৃষ্টি, জীবনাদর্শ ও নীতিমালার মানবিক ও বিশ্বজনীনতার বৈশিষ্ট্যটি বিশ্বজগতের স্রষ্টার নিকট থেকে লাভ করেছে। তাই তার প্রবণতা সর্বদা খোদামুখী। এটি সেই সত্তার নিকট থেকে গৃহীত যিনি সকল সৌন্দর্যের ধারক। তাই এ পথের পথিকের সমগ্র জীবন আনন্দ ও সৌভাগ্য এবং প্রশান্তি ও স্রষ্টার সান্নিধ্যের পবিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ।

সুতরাং কুরআনে বর্ণিত আদর্শ মানুষ জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় বিধি-বিধান– সকল দিকে স্রষ্টার ঐশী নিদর্শনের নমুনা। সে একই সাথে বুদ্ধিমান, বোধশক্তিসম্পন্ন, জ্ঞানী, ধৈর্যশীল, দানশীল, মর্যাদাবান, সৃষ্টিশীল, শৈল্পিক, পবিত্র, নীতিবান, খোদাপ্রেমিক, দৃঢ়তার অধিকারী, সচেতন, গতিশীল, উদার, কৃতজ্ঞ, দায়িত্ব সচেতন, কর্তব্যপরায়ণ, আল্লাহ্‌ ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি নিবেদিত ও পূর্ণ। আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও দাসত্বই তার পূর্ণতার সোপান। তার ব্যক্তিত্বের নিদর্শন হল তার জ্ঞান ও কর্ম– সকল কিছু খোদায়ী কর্তৃত্বের ছায়ায় বিকশিত। তার চিন্তা ও স্মরণ, বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌মুখিতায় একীভূত হয়েছে। তাই তার সকল প্রবণতা নিষ্পাপ, তার সকল চিন্তা পবিত্র ও আলোকিত, তার উপস্থিতি অন্যায়কে করে বিদূরিত, সত্যকে করে উদ্ভাসিত, বিবেকসমূহকে করে জাগ্রত, আর তার হৃদয় প্রশান্ত। এ কারণে তার সংস্পর্শ অন্যকে আলোকিত করে, তার প্রচেষ্টা সমাজকে পরিশুদ্ধ ও পূর্ণতার দিকে ধাবিত করে, তার

নির্দেশনা জাতিকে পথ দেখায়। পবিত্র কুরআন এমন আদর্শ মানুষই গঠন করতে চায়।

উপসংহার

কুরআনের এ মানব-পরিচিতি থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, মানুষ দৈহিক ও আত্মিক– উভয় দিক থেকে সৃষ্টির সেরা ও অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মানুষের এ বিশেষত্বের মূলে রয়েছে তার ঐশী নির্বস্তুক সত্তা অর্থাৎ তার আত্মা। এ আত্মাই তার খোদামুখী প্রবণতাকে (ফিতরাতাল্লাহ্) ধারণ করেছে। আর তাই অস্তিত্বগতভাবে কুরআনী চিন্তাধারায় মানুষকে খোদাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল প্রাণী বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়– যার সত্তা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভের আশায় প্রচেষ্টায় রত। তার অস্তিত্বের শুরু আল্লাহ্র নিকট থেকে আত্মা লাভের মাধ্যমে এবং সে সত্তাগতভাবে তাঁর দিকেই যাত্রাশীল। সুতরাং মানুষের উচিত তার খোদামুখী প্রবণতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে স্বীয় পরিচয় ও মর্যাদার বৈশিষ্ট্য হস্তগত করতে হবে। সে তার নিজের প্রকৃত পরিচয় লাভের মাধ্যমে তার স্রষ্টার পরিচয়ও লাভ করবে। এ পরিচয় লাভ ওহী ও কুরআনের সাহায্য ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন মানুষের সামনে তার পরিচয় তুলে ধরা ছাড়াও তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পথও তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে তা হল ধর্মীয় বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধি, পবিত্র জীবন, আধ্যাত্মিকতা ও খোদাপ্রেম, জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে সংগতি ও ভারসাম্য, কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্যপরায়ণতা, ইবাদাত ও দাসত্ব, সার্বক্ষণিক ও সর্বজনীন পবিত্রতা, চিন্তার সকল দিকে সঠিক দিক নির্দেশনা, আবেগ ও সহানুভূতি, মানবপ্রেম ও মানবসেবা, জ্ঞানমুখিতা ও জ্ঞানপিপাসা, দৈহিক ও আত্মিক উভয় চাহিদার প্রতি প্রয়োজনীয় সাড়া দান, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিকের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি। কুরআনী মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে স্থান ও কালকে নিজের বশীভূত করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। সে তার ঈমান ও সৎকর্মের ছায়ায় ঊর্ধ্বমুখে যাত্রা করে দৃশ্য ও অদৃশ্য, বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় জগতের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ অনন্য বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্ কেবল মানুষকেই দান করেছেন। এ কারণে আল্লাহ্ তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে

মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পূর্ণ মানবদের নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে যাতে তাদের আনুগত্য ও নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে নিজের পরম আকাঙ্ক্ষিত সত্তার সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। মানুষ তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশের মাধ্যমেই কেবল স্রষ্টার সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের প্রকাশস্থল হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। স্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির সার্থকতা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

(সমাপ্ত)

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

তথ্যসূত্র

১. সূরা আনফাল : ৪
২. সূরা আলে ইমরান : ১৬৩
৩. আল্লাহ্‌র নৈকট্যের বিষয়টি বস্তুগত নৈকট্যের মত কোন বিষয় নয়, এমনকি এটি মর্যাদা লাভের ফলে শুধুই পুরস্কার প্রাপ্তির মত কোন বিষয়ও নয়; বরং এটি অস্তিত্বের যে অবিচ্ছিন্ন অসীম ধারা স্রষ্টা থেকে নগণ্যতম সৃষ্টি পর্যন্ত বিদ্যমান সে ধারারই পূর্ণতাজনিত ঊর্ধ্ব যাত্রা যাতে মানুষ অস্তিত্বগতভাবে (ফেরেশতাদের হতেও) উচ্চতর অস্তিত্বে পরিণত হয়।
৪. সূরা আলে ইমরান : ৩১
৫. সূরা ফাত্‌হ : ২৯
৬. সূরা মুজাদালাহ : ২২
৭. হা্‌মীম সিজদা : ৩০
৮. সূরা মুজাদালাহ : ১১
৯. সূরা বাকারা : ২৮২
১০. সূরা আনফাল : ২৯
১১. সূরা যুমার : ৯

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত)

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐশী প্রতিনিধিত্বের সীমা

খলিফা বা প্রতিনিধি হল সেই ব্যক্তি যে প্রতিনিধি নিয়োগকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়। কখনও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সময়গত। অর্থাৎ সময়ের দৃষ্টিতে প্রতিনিধিত্ব লাভকারী ব্যক্তি প্রতিনিধি নিয়োগকারীর পরে আসে এবং কখনও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পর্যায় বা মর্যাদাগত। প্রথম ক্ষেত্রে মর্যাদার দিক থেকে প্রতিনিধি নিয়োগকারী প্রতিনিধির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য নয়। খলিফা বা প্রতিনিধি যার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তার থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে, আবার নিম্নতরও হতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়টি রহিত ও রহিতকারী বিধানের ন্যায়, যেক্ষেত্রে রহিতকারী বিধান রহিত বিধান অপেক্ষা শক্তিশালী। কিন্তু কখনও প্রতিনিধিত্বের এ বিষয়টি অস্তিত্বের ক্রম ও মর্যাদার দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়। এ দৃষ্টিতে প্রতিনিধি নিয়োগকারী অবশ্যই প্রতিনিধি থেকে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিনিধি তার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি নিয়োগদাতার মনোনয়নের কারণে লাভ করে। তার বৈধতা, ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়োগদাতার অনুগ্রহ ও সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল এবং তার অনুগ্রহ ব্যতীত প্রতিনিধির কোন ক্ষমতা ও বৈধতা নেই। সুতরাং প্রতিনিধি অস্তিত্বগতভাবে মর্যাদায় তার নিয়োগকারী হতে নিম্ন পর্যায়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধি কখনও নিজেকে শ্রেষ্ঠ বা নিয়োগকারীর সমপর্যায়ে গণ্য করতে পারে না। এরূপ করলে সে তার বৈধতা হারাবে। এ কারণেই ঐশী প্রতিনিধি ও নবিগণ কখনও নিজেকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ও সমমর্যাদা দানের মত অংশীবাদী চিন্তা করতে পারেন না। তেমনি কোন নবীর ওয়াসি ও প্রতিনিধি ঐ নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন না।

যদিও এ কথা ঠিক যে, ঐশী প্রতিনিধি যখন স্রষ্টার প্রতিনিধি হবেন তখন তাঁর সকল সুন্দর নামসমূহেরও প্রকাশস্থল হবেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র কিছু পূর্ণতার গুণ রয়েছে যেগুলো কেবল তাঁর সত্তার জন্যই নির্দিষ্ট। কোন সত্তা ও ব্যক্তিই তা লাভ করতে পারে না। যেমন আল্লাহ্‌র 'ইলাহ' বা উপাস্য হওয়া এবং নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের (কিবরীয়া) অধিকারী হওয়া। কোন সৃষ্টিকেই এ নাম ও বৈশিষ্ট্যে অভিহিত করা যাবে না। কারণ, তা সুস্পষ্ট শির্‌ক।[১] এ বিষয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'নিজেকে মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গণ্য কর না এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পরাক্রমে কাউকে তাঁর সদৃশ জ্ঞান কর না। কারণ, আল্লাহ্‌ প্রত্যেক অহংকারী ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদারকে লাঞ্ছিত করবেন এবং প্রত্যেক স্বার্থপর কল্পনাবিলাসীকে হীন ও অপমানিত করবেন।'[২]

মহান আল্লাহ্‌র খেলাফতের রহস্য

সাধারণত খলিফা বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে তার নিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতে অথবা তার মৃত্যু (বা অন্তর্ধানের) পরবর্তী সময়ে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে যে, যেহেতু আল্লাহ্‌ সকল সময় সকল স্থানে উপস্থিত[৩] এবং তিনি সকল কিছুকে বেষ্টন করে রয়েছেন,[৪] সেহেতু তাঁর জন্য অনুপস্থিতির চিন্তাও করা যায় না। তাহলে কেন তিনি প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন?

এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, ঐশী প্রতিনিধিত্বের অর্থ বিশ্বজগতের পরিচালনা ও প্রভুত্বের দায়িত্ব গ্রহণ নয়। ঐশী প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যও এটি নয় যে, আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতিনিধির জন্য কোন পদ ছেড়ে দেবেন; বরং এর অর্থ তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য আয়না অর্থাৎ প্রতিফলক ও প্রকাশস্থল হওয়া। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ই স্থায়ী ও চিরন্তন পূর্ণ সত্তা হিসেবে প্রকৃত ও মৌলিক সত্য এবং মানুষ তাঁর নিদর্শনস্বরূপ। তাই মানুষ এক্ষেত্রে মহাসত্যের সকল বৈশিষ্ট্যের প্রদর্শক ও অর্জনকারী সত্তা। সে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে অন্য সকল সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। সুতরাং মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব অস্তিত্বগত– সময়গত নয়।

সাধারণত প্রতিনিধি গ্রহণের ও নিয়োগের দু'টি কারণ থাকে যার একটি নিয়োগকারীর সীমাবদ্ধতার কারণে এবং অপরটি যাদের মধ্যে বা যাদের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়েছে তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে।

স্থলাভিষিক্ত অর্থে প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে পারে, এমনকি আংশিক বা ক্ষুদ্র কোন বিষয়েও তা প্রযোজ্য হয়। এ ধরনের প্রতিনিধিত্ব হযরত হারুন (আ.) তাঁর ভাই হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট থেকে লাভ করেছিলেন। যখন মূসা (আ.) সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে বনি ইসরাইলের মধ্যে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। পবিত্র কুরআন এ বিষয়ের প্রতি ইশারা করে বলেছে : 'মূসা তার ভাই হারুনকে বলল : আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব কর এবং সংস্কার কর, আর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ কর না।'[৫]

যেহেতু আল্লাহ্ অসীম হিসেবে সকল কিছুকে বেষ্টন করে রয়েছেন এবং সকল বিষয়ের সাক্ষী, সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিনিধিত্বের বিষয় অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু কখনও কখনও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি যাদের জন্য বা যাদের উদ্দেশে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হয় তাদের অক্ষমতার কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যাদের মধ্যে প্রতিনিধি প্রেরিত হবে তাদের যোগ্যতা ও ধারণক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিনিধি প্রেরণ অপরিহার্য হয়েছে। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, যেহেতু অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের উপযোগী নয় এবং তাদের ধারণক্ষমতা সীমিত, সেহেতু তারা এরূপ কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে থাকে। যেমন নবিগণ ওহী লাভের উপযোগিতার অধিকারী, তাই তাঁরাই কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তা পেয়ে থাকেন। অন্যান্য মানুষের তা পাওয়ার যোগ্যতা নেই বলেই তারা তা পায় না।

খেলাফতের প্রকারভেদ

ঐশী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে খেলাফতের বিষয়টি প্রতিনিধি নিয়োগকারী অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ও প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ প্রতিফলন ও প্রকাশের মাত্রার পার্থক্যের কারণে প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ের পার্থক্য ঘটে। প্রত্যেক মানুষই তার জ্ঞান ও কর্ম অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের প্রকাশস্থল হয়ে থাকে। মানুষ এ দুই ক্ষেত্রে উৎকর্ষ লাভের মাধ্যমে পূর্ণতর প্রকাশস্থল হওয়ার উপযোগিতা লাভ করে। যতই সে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয় ততই সে পূর্ণতার শীর্ষচূড়ার

নিকটতর হয়। পূর্ণতম প্রকাশস্থল আল্লাহ্‌র প্রথম প্রকাশস্থল (অস্তিত্ব ও মর্যাদাগত দৃষ্টিতে)। সে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই সকল অনুগ্রহ লাভ করে। ইসলামী জ্ঞানের উৎস অনুযায়ী যে পূর্ণতম সৃষ্টি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তিনি হলেন মহানবী (সা.), যিনি তাঁর সুন্দর নামসমূহের প্রথম সৃষ্টি ও প্রথম প্রকাশস্থল। অন্য সকল সৃষ্টি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। যেমন হযরত আদম (আ.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বলে বিবেচিত। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির সমগ্র অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী ও তাঁর ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁর অস্তিত্বের কোন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নেই। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করেছেন অর্থাৎ তিনি স্রষ্টার আয়না হিসেবে তাঁর সকল বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করছেন। তাই তিনি স্রষ্টার জন্য বিলীন হওয়া এক সত্তা। তাই তাঁর প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি অন্য যারা পরোক্ষ প্রতিনিধি তাদের প্রতিনিধিত্বের পথে অন্তরায় নয়। সুতরাং তিনি পূর্ণতম প্রতিনিধি হলেও অন্য পূর্ণ প্রতিনিধিরাও রয়েছেন।[৬]

ঐশী প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র

মানুষের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র সম্পর্কে দু'টি মত রয়েছে। একটি মতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র হল শুধু পৃথিবী।[৭] অপর মতে মানুষের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি পৃথিবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এ প্রতিনিধিত্ব সমগ্র অস্তিত্বজগতে ব্যাপৃত।[৮]

انى جاعل فى الارض خليفة আয়াতাংশের পূর্বের ও পরের আয়াতগুলোর ধরন ও তার থেকে যে সামগ্রিক অর্থ পাওয়া যায় এবং এ আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায় যে, এ প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। বিশেষত হযরত আদম (আ.)-এর সামনে সকল ফেরেশতা, এমনকি বিশ্বজগতের পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের সিজদায় অবনত হওয়া, মানুষের এমন এক সত্তার প্রতিনিধি হওয়ার ঘোষণা দান যার অস্তিত্ব ও পূর্ণতা অসীম ইত্যাদি বিষয়কে এ দাবির সপক্ষে ব্যাখ্যারূপে উপস্থাপন করা যায়। এ দৃষ্টিতে মানুষ সমগ্র অস্তিত্বজগতে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি এবং আয়াতে যে فِ الارض অংশ এসেছে তা প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সীমিত বা নির্দিষ্ট করার জন্য নয়; বরং নিযুক্তির স্থান ও কেন্দ্রের উল্লেখ মাত্র, যেখানে সে তাঁর সুন্দর নামসমূহের প্রতিবিম্ব হিসেবে আবির্ভূত হবে। যদি মানুষ শুধু

পৃথিবীতেই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হয়, তবে ফেরেশতারা আকাশ ও ঊর্ধ্বজগতে তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার সাথে কোন বৈপরীত্য থাকত না। সেক্ষেত্রে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদার নির্দেশ ও এ নির্দেশ তাঁদের পক্ষ থেকে মেনে নেওয়ার ঘটনাটি মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তেমনি ফেরেশতাদের বিশ্বজগতের জন্য রহস্যরূপে বিদ্যমান নামসমূহ সম্পর্কে অবহিত করার বিষয়টিও মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের অন্যতম কারণ। সুতরাং মানুষ মহান আল্লাহ্‌র সকল সুন্দর নাম ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিবিম্ব। এরূপ ব্যাপক ধারণক্ষমতার সাথেই সীমাহীন সত্তার প্রতিনিধিত্ব ধাপ খায়।

ঐশী প্রতিনিধিত্বের স্তর ও পর্যায়সমূহ

ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একটি পর্যায়গত বিষয়। যে সত্তা ঐশী বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারণ করবে তার ধারণক্ষমতা ও উপযোগিতা অনুযায়ী তার প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ে পার্থক্য ঘটবে। ঐশী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে চারটি স্তর কল্পনা করা যায় :

১. ক্ষণস্থায়ী প্রতিনিধিত্ব : যদি ঐশী পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন ব্যক্তির মধ্যে ক্ষণস্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ কখনও কখনও তার মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে বা প্রায়শই বিভিন্ন অবস্থায় সে পূর্ণতাসূচক কর্ম করে, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্য তার নিকট থেকে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকে, তবে সে ক্ষণস্থায়ী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী।

২. দীর্ঘস্থায়ী বা স্বভাবগত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব : যদি কারও মধ্যে পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য এমন মাত্রায় থাকে যে, বলা যায়, এটি তার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও রয়েছে, তবে এরূপ প্রতিনিধিত্বকে স্বভাবগত বা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিনিধিত্ব বলা যায়।

৩. সত্তাগত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব : যদি পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ কারও মধ্যে এমন পর্যায়ে থাকে যে, তার সত্তা গঠনকারী উপাদানে পরিণত হয়, তবে তার প্রতিনিধিত্বকে সত্তাগত পর্যায়ের বলা যায়।

৪. অস্তিত্বগত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব : যদি পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ কারও অস্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, তাকে পৃথক করা অসম্ভব অর্থাৎ তার সমগ্র অস্তিত্বই

পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য দ্বারা গঠিত হয়, তবে তার প্রতিনিধিত্ব অস্তিত্বগত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব। এ পর্যায়ে পৌঁছার অর্থ হল, সে কার্যত স্রষ্টার কান, চোখ ও হাতে পরিণত হয়েছে। এটি পূর্ণতার সর্বোচ্চ পর্যায়। এমন পূর্ণ মানবের সত্তা ও বৈশিষ্ট্য একীভূত অর্থাৎ তার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য অমিশ্র ও মৌলে পরিণত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র সত্তা ও বৈশিষ্ট্য যেমন একে অপর থেকে পৃথক নয়; বরং তাঁর সত্তা ও সকল বৈশিষ্ট্য নিরঙ্কুশভাবে একক ও অসীম এক অস্তিত্ব যাতে (আরোপিত) বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে কিছুই নেই– যা আছে তা কেবল নিরেট অস্তিত্ব, তেমনি এমন পূর্ণ মানব তাঁর দর্পণ হওয়ার কারণে তার সত্তাও বৈশিষ্ট্যশূন্য এ অর্থে যে, তার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য একই– পরস্পর পৃথক কিছু নয়।[৯]

হযরত আলী (আ.) আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন : 'পূর্ণ ইখলাস (নিখাঁদ তাওহীদী বিশ্বাস) হল আল্লাহ্‌র জন্য কোন (আরোপিত) বৈশিষ্ট্য নাকচ করা।'[১০]

সুতরাং পূর্ণতম তাওহীদী বিশ্বাসের জন্য মহান আল্লাহ্‌কে সকল (আরোপিত) বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত মনে করতে হবে। বিশ্বাসের এ বিষয়টি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মগত তাওহীদ অর্জিত হয়। পূর্ণ মানব নিজের বৈশিষ্ট্যকে তার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার মাধ্যমে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যসমূহের পূর্ণ প্রতিবিম্ব ও নিদর্শন হয় এবং স্রষ্টার সত্তার উপমায় রূপান্তরিত হয়, যেমনটি আল্লাহ্ বলেছেন : لله المثل الاعلى في السماوات والارض অর্থাৎ তাঁর জন্যই আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ উপমা রয়েছে।[১১] পূর্ণতম মানব মহান আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ উপমা যার মধ্যে স্রষ্টার সকল বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

ঐশী প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত থাকা

পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত যে, পৃথিবীর বুকে সকল সময় মহান আল্লাহ্‌র একজন পূর্ণতম প্রতিনিধি রয়েছেন। কোন সময়ই পৃথিবী তাঁর এমন প্রতিনিধি– যাঁর মধ্যে তাঁর সকল সুন্দর নামসমূহের প্রতিফলন ঘটেছে– থেকে শূন্য থাকতে পারে না। মহান আল্লাহ্ হযরত আদমকে সৃষ্টির পূর্বে ফেরেশতাদের এ কথাই বলেছেন। কারণ, তিনি বলেছেন : اني جاعل في الارض خليفة অর্থাৎ 'অবশ্যই আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্তকারী।' جاعل (নিযুক্তকারী) শব্দটি কর্তৃবাচক যা আরবি

ব্যাকরণে অব্যাহতভাবে কর্তার নিকট থেকে এরূপ কর্ম সংঘটিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে কাউকে না কাউকে এমন প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করতে থাকবেন। সুতরাং খেলাফতের এ বিষয়টি সাময়িক কোন বিষয় নয়; বরং আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)-কে এরূপ বৈশিষ্ট্যের একটি নমুনা হিসেবে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করেছেন। অন্যদিকে সৃষ্টিজগৎ তার অস্তিত্বগত সীমাবদ্ধতার (ধারণক্ষমতার ক্ষেত্রে) কারণে স্রষ্টার নিকট থেকে সরাসরি অনুগ্রহ লাভে সক্ষম নয়। এ কারণে তারা পূর্ণ মানব ও আল্লাহ্র হুজ্জাতের মুখাপেক্ষী। ফেরেশতামণ্ডলী আল্লাহ্র অনুগ্রহ-ধন্য হলেও পূর্ণ মানবরা যে বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী, তাঁরা তা লাভ করতে সক্ষম নন। কারণ, অস্তিত্বগতভাবে পূর্ণ মানবদের মর্যাদা ফেরেশতাদের থেকে ঊর্ধ্বে। কিন্তু এরূপ পূর্ণ মানবের সংখ্যা খুবই কম। আলী (আ.) বলেন : 'হ্যাঁ, কখনই পৃথিবী এমন অভিভাবক (মানব জাতি ও সৃষ্টির ওপর আল্লাহ্র নিদর্শন)–যিনি আল্লাহ্র জন্য স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে উত্থিত হবেন–বিহীন থাকে না। তিনি (সেই অভিভাবক) প্রকাশিত ও পরিচিত অথবা ভীতির কারণে লুক্কায়িত ও অপ্রকাশিত। এটি এজন্য যে, যেন আল্লাহ্র দলিল ভ্রান্ত ও বৃথা (প্রমাণিত) না হয় এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ বিলুপ্ত না হয়। তাঁদের সংখ্যা কত নগণ্য! এবং তাঁরা কোথায়? আল্লাহ্র শপথ, তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় অনেক উচ্চ। আল্লাহ্ তাঁদের মাধ্যমে তাঁর প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহকে সংরক্ষণ করেন... তাঁরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র মনোনীত প্রতিনিধি এবং তাঁর ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী। আহ্! আহ্! আমি তাঁদের দেখার জন্য কত উদগ্রীব!'[১২]

সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র মনোনীত এমন প্রতিনিধিরা রয়েছেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী তাঁদের সামনে সিজদায় অবনত। এটি ফেরেশতামণ্ডলীর ওপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ।

উপসংহার

খেলাফত অর্থ কোন কিছুর অপর বস্তুর পশ্চাতে আগমন এবং ঐশী প্রতিনিধিত্বের অর্থ পৃথিবীতে মানুষের আল্লাহ্র স্থলাভিষিক্ত হওয়া। ঐশী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। এ প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য মতসমূহ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা

হয়েছে। ঐশী প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াত থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হল হযরত আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানরা। তাদের প্রতিনিধিত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং সমগ্র আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তাদের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র। ফেরেশতারা মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের রহস্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যখন হযরত আদম (আ.) তাঁদের নামসমূহ সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন তাঁরা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জানলেন। ফেরেশতারা হযরত আদম (আ.)-কে মানুষের মধ্যে যে সকল পূর্ণ মানব আসবেন তাঁদেরকে প্রতিনিধি হিসেবে সিজদা করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে 'নামসমূহ' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরদের নিকট থেকে বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু ফেরেশতারা বিশ্বজগতের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এ সকল নাম সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন, সেহেতু বলা যায়, নামসমূহ ফেরেশতাদের ঊর্ধ্বের জগতের সত্তা ছিলেন। এ বিষয়ে আমাদের মত হল : ঐ নামসমূহ সৃষ্টিজগতের মূল ও উৎসরূপ ভাণ্ডার যাকে 'ঐশী বাস্তব সত্তা' বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে অবহিতিই হযরত আদমকে ফেরেশতাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বদান করেছিল এবং হযরত আদমের সন্তানরা যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে তাদের মধ্যে একটি দল পূর্ণ মানব হিসেবে ঐ নামসমূহ সম্পর্কে অবহিত এবং অপর দল অর্থাৎ বাকী সকলের মধ্যে ঐ নামসমূহকে জানার যোগ্যতা থাকার কারণে তারাও ঐশী প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা রাখে। যদি তারা ঐশী গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হয়, তবে বাস্তবে তারা ঐশী প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হবে। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে যতটুকু ঐশী বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে ও আল্লাহ্‌র গুণাবলি অর্জন করবে সে তার পর্যায়ে (ধারণক্ষমতা অনুযায়ী) ঐশী প্রতিনিধিত্বের আসন লাভ করবে। এক্ষেত্রে পূর্ণতম মানব আল্লাহ্‌র মহিমান্বিত, গরিমাময় ও উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অন্যান্য পূর্ণ মানব তাঁদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র সকল গুণ ধারণ করেন এবং মুমিনরাও তাদের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী সকল অথবা আংশিকভাবে আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যসমূহ অর্জন করে। তাদের কেউ ঐ বৈশিষ্ট্যকে তার অভ্যাসে, কেউ তার সত্তায়, আবার কেউ তার অস্তিত্বের অংশে পরিণত করে। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র প্রথম ও পূর্ণতম সৃষ্টি হিসেবে আল্লাহ্‌র সকল বৈশিষ্ট্যের ও সুন্দর নামসমূহের দর্পণ এবং তাঁর ন্যায় সকল (আরোপিত) বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দর্পণ হিসেবে তার সত্তা ও বৈশিষ্ট্যও একীভূত ও অবিভাজ্য এক

অস্তিত্বে পরিণত। সুতরাং তিনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম খলিফার দৃষ্টান্ত। পবিত্র ইমামগণ ও অন্য সকল নবী তাঁর প্রতিনিধি হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র খলিফা বলে বিবেচিত। এক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই আল্লাহ্‌র হুজ্জাত ও নিদর্শন, যদিও তাঁদের মধ্যে পর্যায়গত পার্থক্য রয়েছে।

(সমাপ্ত)

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

তথ্যসূত্র

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমূলী, তাফসীরে তাসনীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১-১০৪, প্রকাশকাল ১৩৮০ ফারসি সাল, ইসরা প্রকাশনী, কোম, ইরান

২. নাহজুল বালাগা, পত্র ৫৩

৩. এক্ষেত্রে এ আয়াতগুলো লক্ষণীয় : 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও আল্লাহ্ সেদিকেই রয়েছেন' (সূরা বাকারা : ১১৫); 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন' (সূরা হাদীদ : ৪); 'যারাই এতে (পৃথিবীতে) রয়েছে তারা ধ্বংসশীল এবং কেবল প্রতাপ ও সম্মানের অধিপতি তোমার প্রতিপালকের সত্তা অবিনশ্বর' (সূরা আর রহমান : ২৬-২৭)

৪. 'জেনে রাখ, তিনি (আল্লাহ্) সকল কিছুকে বেষ্টন করে রয়েছেন' (সূরা হা-মীম সিজদাহ : ৫৪); এবং বস্তুত আল্লাহ সকল কিছুকে বেষ্টন করে রয়েছেন' (সূরা নিসা : ১২৬)

৫. সূরা আরাফ : ১৪২

৬. আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমূলী, তাফসীরে তাসনীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪-১০৭

৭. রাশিদ রিদা, তাফসীরে আল মানার, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮, দারুল ফিক্‌র প্রকাশনী, বৈরুত, ১৪১৪ হিজরি

৮. আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমূলী, তাফসীরে তাসনীম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৮

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৯

১০. নাহজুল বালাগা, খুতবা ১

১১. সূরা রূম : ২৭

১২. নাহজুল বালাগা, সংক্ষিপ্ত বাণী ১৪৭

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত।)

পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিচয়, মর্যাদা ও আনুগত্য

মো. আশিফুর রহমান

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে হেদায়াত করার জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছিলেন। প্রসিদ্ধ মতে পৃথিবীতে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী-রাসূল এসেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন তাঁদের সর্বশেষ। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বাণী প্রচার করেছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন মানব জাতির আদর্শ।

আমরা মুসলমান। একজন মুসলমান হিসেবে মহানবী (সা.)-এর পরিচয় আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকা একান্ত আবশ্যক। আর এ পরিচয় লাভের জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় ও প্রধান অবলম্বন হল পবিত্র কুরআন। পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের সামনে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা.)-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে তাঁর মর্যাদা, তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, উম্মতের ওপর তাঁর অধিকার, তাঁর আনুগত্য, তাঁর প্রতি ভালবাসার কথা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য করার প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি তাঁর বিরোধিতা না করা, তাঁকে কষ্ট না দেওয়ার বিষয়গুলোও বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর পরিণাম সম্পর্কেও অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে পবিত্র কুরআনের সেসব আয়াতের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক আয়াত নিয়ে আলোচনা করা হল।

১. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচয়

ক. সর্বশেষ নবী : মহানবী (সা.) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ ...

'মুহাম্মদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষ নবী।'– সূরা আহযাব : ৪০

খ. সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত : পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ অন্যান্য নবী সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন নিজ নিজ জাতির জন্য। যেমন হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে সূরা আরাফের ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ ...

'নিশ্চয়ই আমরা নূহকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম...।'

হযরত হূদ (আ.) সম্পর্কে একই সূরার ৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ...

'এবং আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছিলাম...।'

হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَـٰتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّـٰمِ ٱللَّهِ ...

'এবং আমি মূসাকে আমাদের নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, আপনার স্বজাতির লোকদের অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে আসুন এবং তাদের আল্লাহ্‌র দিনসমূহ স্মরণ করান...।'–সূরা ইবরাহীম : ৫

এভাবে হযরত সালেহ্ (আ.), হযরত শুআইব (আ.) এবং অন্য নবীদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ একই কথা বলেছেন।

কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

'এবং আমরা আপনাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি...।'– সূরা সাবা : ২৮

আবার অন্যত্র বলেছেন :

وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

'আমরা আপনাকে মানব জাতির জন্য রাসূল করে প্রেরণ করেছি, সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।'– সূরা নিসা : ৭৯

অন্য একটি আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ ...

'হে মানব জাতি! রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে সত্যসহ আগমন করেছে...।' নিসা : ১৭০

অর্থাৎ একজন হাদী– একজন পথ প্রদর্শক হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এসেছিলেন সমগ্র মানব জাতির মাঝে।

গ. সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত : আর সমগ্র সৃষ্টির জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন রহমতস্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে বলছেন :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

'আমি আপনাকে জগৎসমূহের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' সূরা আম্বিয়া : ১০৭

উল্লেখ্য যে, জগৎসমূহ বলতে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল সৃষ্টিকেই বোঝানো হয়েছে।

ঘ. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ : মহান আল্লাহ রাসূলকে উজ্জ্বল প্রদীপরূপে আখ্যায়িত করেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

'হে নবী! নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।'– সূরা আহযাব : ৪৫-৪৬

ঙ. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্র গুণাবলিতে ভূষিত : মহান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর প্রশংসায় তাঁর গুণবাচক নাম 'রাউফ' (দয়ার্দ্র) ও 'রাহীম' (পরম দয়ালু) ব্যবহার করেছেন। যেমন মুমিনদের প্রতি তাঁর ভালবাসাকে আল্লাহ্ এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

'(হে লোকসকল!) তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে, (তোমাদের প্রতি তার অনুকম্পার পরিচয় এই যে,) তোমাদের দুর্ভোগ তার পক্ষে দুর্বিষহ। সে তোমাদের (পথ প্রদর্শনের) অভিলাষী, বিশ্বাসীদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।'– সূরা তওবা : ১২৮

এভাবে আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর মর্যাদাকে উচ্চ করেছেন।

চ. কাফিরদের প্রতিও পরম সহানুভূতিশীল : মহানবী (সা.) আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি মানুষকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। শুধু মুমিন নয়, কাফিরদের প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল ও অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। মহানবী (সা.) দীর্ঘদিন মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। কিন্তু মানুষের অসচেতনতা ও গোঁড়ামি তাঁকে ব্যথিত করত। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন যে, আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হয়ে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এভাবে :

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا

'আর সম্ভবত তুমি তোমার জীবনকে তাদের পেছনে শোকে-দুঃখে ধ্বংস করে দেবেন যদি তারা এ কথায় ঈমান না আনে।'– সূরা কাহাফ : ৬

সূরা ফাতিরের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন :

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

'তাদের পেছনে যেন আক্ষেপ ও দুঃখে তোমার জীবন নিঃশেষ না হয়।'

আরেকটি আয়াতে তিনি বলেছেন :

لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

'তারা ঈমান আনে না বলে তুমি হয়ত মর্মব্যথায় আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।'– সূরা শুআরা : ৩

ছ. মানব জাতির জন্য আদর্শ : তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ্ বলছেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...

'নিশ্চয়ই রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ...।'– সূরা আহযাব : ২১

মহান আল্লাহ্ আরও বলছেন :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'–সূরা কলম : ৪

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা

ক. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সম্বোধন : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.) ছাড়া অন্যান্য নবী-রাসূলকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিতে গিয়ে বা কিছু বলতে গিয়ে নাম ধরে সম্বোধন করেছেন। অথচ মহানবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করেছেন। মহান আল্লাহ্ কখনই তাঁর নামে সম্বোধন করেননি। তিনি তাঁকে 'নবী', 'রাসূল' অথবা কোন বিশেষণ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সম্বোধনের কিছু নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হল। হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্বোধন :

وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ...

'এবং আমরা (আদমকে) বললাম : হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর... ।'– সূরা বাকারা : ৩৫

হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি সম্বোধন :

يَـٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا ...

'হে নূহ! অবতরণ কর আমাদের নিরাপত্তাধীনে ।'– সূরা হূদ : ৪৮

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি সম্বোধন :

يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَآ ...

'হে ইবরাহীম! এ ব্যাপারে নিবৃত্ত হও... ।'– সূরা হূদ : ৭৬

হযরত মূসা (আ.)-কে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّهُۥٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

'হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।'- সূরা নামল : ৯

হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বলছেন :

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَٰلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ...

'(স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তোমার ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহকে স্মরণ কর; যখন আমি পবিত্র আত্মা (জিবরীল) দ্বারা তোমাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছি... ।'– সূরা মায়েদাহ : ১১০

এভাবে হযরত দাউদ, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সকলের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নাম ধরে সম্বোধন করেছেন । অন্যদিকে মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সম্বোধন করছেন 'রাসূল' বলে । যেমন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ

'হে রাসূল! যা (যে আদেশ) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর যদি তুমি তা না কর, তবে তুমি (যেন) তার কোন বার্তাই পৌঁছাওনি... ।'– সূরা মায়েদাহ : ৬৭

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ...

'হে রাসূল! যারা কুফরীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাদের কর্ম আপনাকে যেন বেদনাহত না করে ।'– সূরা মায়েদাহ : ৪১

আবার কোন কোন আয়াতে 'নবী' বলেও সম্বোধন করেছেন । যেমন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ...

'হে নবী! আল্লাহ্ই আপনার জন্য যথেষ্ট... ।'– সূরা আনফাল : ৬৪

অথবা কোন কোন আয়াতে আল্লাহ্ বিশেষণ যোগে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করেছেন । যেমন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾

' হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত ।'– সূরা মুয্যাম্মিল : ১-২

অন্যত্র বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! ওঠ, আর সতর্ক কর ।'– সূরা মুদ্দাস্সির : ১-২

অন্যান্য নবী-রাসূলের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি ছিল । যেমন, আদম (আ.)-এর উপাধি ছিল সিফওয়াতুল্লাহ্, নূহ (আ.)-এর নবীউল্লাহ্, ইবরাহীম (আ.)-এর খলীলুল্লাহ্, ইসমাঈল (আ.)-এর যাবিহুল্লাহ্, মূসা (আ.)-এর কালিমুল্লাহ্ এবং ঈসা (আ.)-এর উপাধি ছিল

রুহুল্লাহ্, আর কুরআন মাজীদে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্পাক সম্বোধন করেছেন 'রাসূলুল্লাহ্' (আল্লাহ্র রাসূল) বলে।

পবিত্র কুরআনের যেখানে 'আল্লাহ্র রাসূল' অথবা 'রাসূল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বোঝানো হয়েছে। যেখানে অন্যান্য নবীর নামের সাথে 'রাসূল' বলা হয়েছে, সেখানে তা 'প্রেরিত' (দূত) অর্থে এসেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ক্ষেত্রে তা এসেছে সম্মানার্থে।

খ. মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মহানবী (সা.)-এর জীবনের কসম দেওয়া : মহানবী (সা.)-এর মহান মর্যাদার অন্যতম নিদর্শন হল, মহান আল্লাহ্ তাঁর জীবনের কসম দিয়েছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ

'আপনার জীবনের কসম! নিশ্চয়ই তারা তাদের মত্ততার মধ্যে অস্থির রয়েছে।'– সূরা হিজ্র : ৭২

গ. রাসূলের প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষণ : মহানবী (সা.)-এর আরেকটি বিশেষ মর্যাদা হল, সবসময় তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হয় এবং ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য দরুদ পাঠ করেন। আর মহান আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর রাসূলের প্রতি দরুদ পাঠ করার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।'– সূরা আহযাব : ৫৬

ঘ. রাসূলের প্রতি অপবাদের জবাব দান : মহানবী (সা.)-এর একটি অনন্য মর্যাদা হল কাফির-মুশরিকরা তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ দিয়েছিল সেসবের জবাব স্বয়ং

আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত অপবাদের জবাব নিজেরাই দিতেন। যেমন নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি নূহ (আ.)-এর কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে :

قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى ضَلَٰلَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦١﴾

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল : আমরা নিশ্চিত দেখছি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় রয়েছ। সে (নূহ) বলল : হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে ভ্রষ্টতার তো কিছুই নেই; বরং আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন রাসূল।'– সূরা আরাফ : ৬০-৬১

হযরত হূদ (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾

'তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা অবিশ্বাস করেছিল, (তারা) বলল : নিশ্চয় আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখছি এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি। সে (হূদ) বলল : হে আমার জাতি! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই; বরং আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।'– সূরা আরাফ : ৬৬-৬৭

অন্যদিকে কাফির-মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে কবি, গণক, পাগল, যাদুকর ইত্যাদি অপবাদ দিত, আর মহান আল্লাহ্ নিজেই এগুলো অপনোদন করতেন। যেমন :

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾

‘আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও, এবং যা তোমরা দেখতে পাও না; নিশ্চয়ই এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এটা জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।’– সূরা হাক্কাহ্ : ৩৮-৪৩

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূল যে পাগল নন তা বলছেন :

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

‘অতএব, তুমি উপদেশ দান করতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নও, উন্মাদও নও।’ সূরা তূর : ২৯

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলছেন :

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

‘আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভন নয়।’ সূরা ইয়াসীন : ৬৯

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা

একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবেন মহানবী (সা.)। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান তাঁকে সর্বাপেক্ষা ভাল না বাসবে ততক্ষণ সে মুমীনই হতে পারবে না। মানুষের কর্মের মাধ্যমে তার মনের অবস্থা প্রকাশিত হয়। এ কর্মের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয় তার ভালবাসার পাত্রের পরিচয়। একজন মুসলমান হিসাবে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হবেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। আমরা দাবিও করি তা-ই। কিন্তু আমাদের অনেকেরই কর্ম অনেক সময় বলে দেয় যে, আমাদের ভালবাসার পাত্র রাসূল নন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের পুণ্যের কাজ করার আদেশ করেছেন, আর পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, কিন্তু আমরা এর বিপরীত

কাজ হরহামেশাই করে থাকি। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলছেন, 'আমি বুঝতে পারি না যে, মানুষ আমাকে ভালবাসার দাবি করে, অথচ তারা পাপ কাজে লিপ্ত হয়!'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে বিষয়গুলোতে খুশী হতেন তাঁকে ভালবাসলে নিশ্চয়ই আমরাও সে বিষয়গুলোতে খুশী হব, আর তিনি যে বিষয়গুলোতে ব্যথিত হতেন সে বিষয়গুলোতে আমরাও ব্যথিত হব। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়, তবে আমরা সত্যিকার অর্থে তাঁকে ভালবাসার দাবি করতে পারি না। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, আমাদের প্রিয়জনের আনন্দের বিষয়গুলোতে আমরা আনন্দিত হই। তাদের দুঃখের বিষয়গুলোতে আমরা দুঃখিত হই। এটাই আমাদের সত্যিকারের ভালবাসা প্রকাশ করে। তেমনি রাসূল (সা.) যাদের ভালবাসেন আমরাও তাদের ভালবাসব, আর যারা রাসূলকে এবং তিনি যাদের ভালবাসেন তাদেরকে কষ্ট দেয়, তাদের প্রতি আমরা কখনই ভালবাসা পোষণ করতে পারি না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আ.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন এবং তাঁদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা নানাভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। যেমন খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আলী সম্পর্কে বলেছেন : 'আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।'[১] ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'হে আল্লাহ্! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাদের ভালবাস এবং যে ব্যক্তি এদের ভালবাসবে, তুমি তাদেরও ভালবাস।'[২]

আবার তাঁদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন : 'ফাতিমা আমার (অস্তিত্বের) একটি অংশ। যে তাকে রাগান্বিত করল, সে আমাকে রাগান্বিত করল।'[৩] আবার হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'তোমরা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং তোমরা যাদের সাথে শান্তি স্থাপন করবে আমিও তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করব।'[৪]

রাসূলের সাহাবিগণও তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করতেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মুসলমানদের একটি দল রাসূলের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনে দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের খুব অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁরই উম্মতের

বিপথগামী একদল লোকের হাতে তাঁর প্রাণপ্রিয় জামাতা ও দৌহিত্রদের শাহাদাত বরণ করতে হয়।

এ প্রসঙ্গে মুহররম মাসের বিষয়টি চলে আসে। মুহররমের দশ তারিখ তথা আশুরা পালন করা হত একটি শোকের দিন হিসেবে। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একটি দল কর্তৃক এ দিনকে আনন্দের দিন হিসেবে পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিয়ে-শাদী ও অন্যান্য আনন্দ অনুষ্ঠানের জন্য মুহররম মাসকে, বিশেষভাবে এ দিনটিকে বেছে নেওয়া হচ্ছে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, যেহেতু এ মাস মুসলমানদের বর্ষপঞ্জির শুরুর মাস, তাই মুসলমানদের অনেক জাঁকজমকের সাথে এ মাসটি উদ্‌যাপন করা উচিত। কিন্তু আমরা ভুলে যাই, এ মুহররম মাস প্রতি বছর মুসলমানদের এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে আসে যে, এ মাসই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মহান আত্মত্যাগের মাস। এ মাসেরই দশ তারিখে তিনি তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রচারিত ধর্ম ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য নিজের প্রিয় পরিবার-পরিজন নিয়ে কারবালার মরুপ্রান্তরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর প্রিয় নাতির মৃত্যুদিবসে খুশী হতেন না। বরং ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম হুসাইনের জন্মের পরই যখন জিবরীল (আ.) তাঁর শাহাদাতবরণের বিষয়টি রাসূলকে জানান তখন রাসূল ভীষণভাবে ক্রন্দন করেন। তবে কিভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালবাসার দাবি করে তাঁর প্রিয় নাতির শাহাদাতের দিন আনন্দ উৎসব করব? বেহেশতের যুবকদের নেতার[৫] বিরুদ্ধাচরণ কি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ নয়? আল্লাহ্‌র রাসূল বলছেন : 'হুসাইন আমা থেকে, আমি হুসাইন থেকে।'[৬] 'যে হুসাইনের সাথে যুদ্ধ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ করি।'– রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ উক্তি থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, ইমাম হুসাইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং রাসূলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো একই কথা?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ ...

'তুমি আল্লাহ্ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের– হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা,

পুত্র, ভাই অথবা এদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান... ।'– সূরা মুজাদালাহ্ : ২২

অর্থাৎ যদি কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে তবে সে মুমিনই থাকতে পারে না।

যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে সবচেয়ে বেশি ভালবাসবে না তাকে পবিত্র কুরআনে ফাসেক বলা হয়েছে :

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

'(হে রাসূল!) তুমি বল, 'তোমাদের পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি, ভাইয়েরা, স্ত্রীরা, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হওয়ার আশংকা করছ এবং সেই বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, (এ সমস্তই) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তার আদেশ (শাস্তি) প্রেরণ করছেন; এবং আল্লাহ্ ফাসেক (অবাধ্য) সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।'– সূরা তাওবা : ২৪

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অধিকার

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হলেন মুমিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের ওপর সবদিক দিয়েই কর্তৃত্বশীল। একজন মুমিন তার জীবনের ওপর যতটুকু অধিকার রাখে তার জীবনের ওপর মহানবী (সা.) তার থেকেও বেশি অধিকার রাখেন। এ কথাটিই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে এভাবে :

ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।' সূরা আহযাব : ৬

মুমিনদের প্রতিটি বিষয়ে রাসূলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন নর ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অধিকার থাকবে না।'– সূরা আহযাব : ৩৬

৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য

মহান আল্লাহ মহান নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন যাতে মানুষ তাঁদের আনুগত্য করে। তিনি বলেন :

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ

'আমরা কোন রাসূলকেই এ উদ্দেশ্য ছাড়া প্রেরণ করিনি যে, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়।'– সূরা নিসা : ৬৪

মহান আল্লাহ্ তাঁর আনুগত্যের সাথে নবী-রাসূলগণের আনুগত্যকে কখনই পৃথক করেননি। যেমন :

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ

'যে রাসূলের আনুগত্য করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।'– নিসা : ৮০

এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বাবস্থায় নবী-রাসূলগণের নিষ্পাপত্বের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। যদি মহান নবী-রাসূলগণের ভুলত্রুটি বা পাপ করার অবকাশ থাকত তাহলে তাঁদের আনুগত্য মহান আল্লাহ্র আনুগত্য বলে গণ্য হত না।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।'– সূরা হাশর : ৭

আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ মুমিনদের উদ্দেশে বলেছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশক, তাদের আনুগত্য কর[৩]; অতঃপর যদি কোন বিষয়ে মতভেদ কর তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসী হও, তবে এ পদ্ধতি তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পরিণামেও সর্বোত্তম।'- সূরা নিসা : ৫৯

এ আয়াতে আল্লাহর আনুগত্যকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণে অনেকে বলেন যে, আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে রাসূলের আনুগত্য ভিন্ন হবে। অথচ পবিত্র কুরআনের অন্য অনেক আয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের আনুগত্যের বিষয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ না করে একত্রেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

'হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও এবং তোমরা যখন তার কথা শুনতে পাও তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।' সূরা আনফাল : ২০

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾

'এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, আর পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ কর না, অন্যথায় তোমরা মনোবল হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাবশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আর ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'– সূরা আনফাল : ৪৬

নবী-রাসূলগণের আনুগত্য সম্পর্কে এত আয়াত থাকা সত্ত্বেও অনেকে মনে করতেন যে, নবী-রাসূলগণের আদেশ বা মিমাংসা ভুল হতে পারে। তাদের এ মনোভাব দূর করতে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا ﴿٦٥﴾

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা কখনই বিশ্বাসী হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে তাদের বিচারক করবে; অতঃপর যা তুমি মীমাংসা করবে তার প্রতি তারা তাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে।'– সূরা নিসা : ৬৫

লক্ষণীয় যে, যে কোন মতভেদের বিষয়েই রাসূল (সা.)-এর বিচারকে মেনে নিতে হবে এবং এক্ষেত্রে কোন ওজর পেশ করা যাবে না। শুধু তা-ই নয়, এ মেনে নেওয়া বাধ্য হয়ে মেনে নেওয়া হতে পারবে না; বরং রাসূল (সা.) যা ফয়সালা করবেন তা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যাপারে অন্তরে কোন খেদ রাখা যাবে না।

অর্থাৎ রাসূলের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত কেউ মুমিনই হতে পারবে না।

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ

আনুগত্যের চেয়েও ব্যাপক হল অনুসরণের বিষয়। বলা হয় যে, আনুগত্য হয়ে থাকে নির্দেশের প্রেক্ষিতে। কিন্তু অনুসরণ নির্দেশের বাইরেও ব্যাপক বিষয়কে শামিল করে। মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে মানুষের উদ্দেশে বলতে নির্দেশ দিয়েছেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾

'(হে রাসূল!) বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের গুনাহকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, অনন্ত করুণাময়।'– সূরা আলে ইমরান : ৩১

আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণকে তাঁর সত্তার প্রতি ভালবাসার মানদণ্ডস্বরূপ নিরূপণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার দাবি যথেষ্ট হতে পারে না, যতক্ষণ নিজ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রমাণ না করা হবে যে, সে রাসূলের খাঁটি অনুসারী। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করতে হবে। যেভাবে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলকে অনুসরণ করতে হবে তেমনি সমাজ, রাজনীতি, আইন-কানুন, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে শতভাগ অনুসরণ করতে হবে।

৬. রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যের পুরস্কার

মানুষের মধ্যে ঈমানের দিক থেকে সবাই একই অবস্থায় নেই। তাই রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। রাসূলের নিঃশর্ত আনুগত্য খুব সহজ বিষয় নয়। যাদের ঈমান দৃঢ় নয় তাদের পক্ষে এমন আনুগত্য অসম্ভব বলেই মনে হবে। আর তাই আনুগত্যকারীদের পুরস্কারও অনেক বেশি। মহান আল্লাহ্ বলছেন :

۞ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হবে ও সৎকাজ করবে তাকে আমি দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত রেখেছি।'– সূরা আহযাব : ৩১

৭. রাসূলের রিসালাতের প্রতিদান

নবী-রাসূলগণ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে হেদায়াতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর তাই এর প্রতিদান তাঁর মহান আল্লাহ্র কাছ থেকেই নেবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতীত অন্য সকল নবী-রাসূল এ কথাটিই তাঁদের উম্মতের সামনে বলেছেন যে, তাঁর তাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চান না। যেমন নূহ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলছেন :

وَيَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে কোন ধন-সম্পদের প্রার্থী নই। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর দায়িত্বে।'– সূরা হূদ : ২৯

হযরত হূদ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে বলছেন :

يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান (পারিশ্রমিক) চাই না; আমার প্রতিদান কেবল তাঁর জিম্মায় যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ কর না।'– সূরা হূদ : ৫১

এভাবে অন্য নবী-রাসূলগণেরও একই বক্তব্য ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মহান আল্লাহ্ই আদেশ দিচ্ছেন

যেন তিনি উম্মতের কাছ থেকে এর প্রতিদান চেয়ে নেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন :

قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ

'তুমি বল : আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে (আমার) নিকট আত্মীয়দের (আহলে বাইতের) প্রতি ভালবাসা ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'– শূরা : ২৩

এখন প্রশ্ন হল, কেন মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-কে তাঁর ঐশী দায়িত্ব পালনের প্রতিদান তাঁরই উম্মতের কাছে চাওয়ার জন্য আদেশ করলেন এবং তাও এমন একটি বিষয় যা আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ জাগতিক বিষয় হিসাবেই প্রতিভাত হয়? অনেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাধার সম্মুখীন হলেন তখন মহান আল্লাহ্ তাঁকে এ কথা বলতে বললেন, 'যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন বা আমার আনুগত্য না কর, তবে অন্তত আত্মীয়তার খাতিরে তো আমার বিরোধিতা বন্ধ কর বা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হও। এর পাশাপাশি তাঁরা এ কথাও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নিকট আত্মীয়দের প্রতি ভালবাসাকে তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিনিময় বলতে পারেন না। কেননা, এটি অত্যন্ত হালকা বিষয়। যেহেতু অন্য কোন নবী-রাসূল এমন কথা বলেননি, তাই যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথা বলেন তাহলে এটা তাঁর মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় না। প্রকৃতপক্ষে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ আদৌ হালকা কোন বিষয় নয়; বরং তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আমাদের হেদায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে সাকালাইনে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও পাওয়া যায়। তিনি বলছেন : 'আমি তোমাদের জন্য দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহ্র কিতাব আল কুরআন, অন্যটি আমার বংশধর আহলে বাইত।'[৭]

সুতরাং এখান থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহলে বাইতের বিষয়টি ঐশী নির্দেশনার অংশ। এ হাদীসের বক্তব্য অনুসারে রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইত পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি পথভ্রষ্টতার থেকে বেঁচে থাকার অবলম্বন। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব পালনের

প্রতিদানস্বরূপ উম্মতকে তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণের নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর মিশনই ছিল মানুষকে হেদায়াত করা। রাসূল (সা.) এজন্য প্রেরিত হয়েছিলেন যেন মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁর দেখানো পথে চলে। যদি মানুষ এ কাজ করে তবেই তাঁর মিশনের প্রতিদান দেওয়া হবে। অর্থাৎ তিনি যা চান তা তাঁকে দেওয়া হবে। এ আয়াতের উদ্দেশ্যও এটাই। এ কারণেই পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসাকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছে। আসলে এ আয়াত উম্মতের হেদায়াতের সাথে জড়িত। হেদায়াতের মূল কথাটি বলা হয়েছে এ আয়াতে যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি! কেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটাত্মীয় তথা আহলে বাইতকে ভালবাসতে হবে? আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা না থাকলে কীভাবে আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব? বরং ভালবাসা থাকলেই নির্দ্বিধায় কোন প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই মানুষ তার প্রেমাস্পদের জন্য সবকিছু কুরবানী করে দিতে পারে। যদি সত্যিকার ভালবাসা না থাকে তবে মৌখিক দাবি কোন কাজেই আসবে না। যেমনটা ঘটেছিল ইমাম আলী (আ.), ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ক্ষেত্রে। আহলে বাইতের সদস্য হিসেবে তাঁরা ছিলেন হেদায়াতের কাণ্ডারী। আর তাঁদের বিপক্ষ ছিল পথভ্রষ্ট। অথচ মুসলমানরা দ্বিধান্বিত হয়েছে। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আহলে বাইতকে ভালবাসার দাবি করা সহজ, কিন্তু আলী (আ.)-এর নির্দেশ মেনে চলা সহজ নয়, ইমাম হুসাইনকে ভালবাসার দাবি করা সহজ, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা সহজ নয়। আমরা বারবার আহলে বাইতের ভালবাসার দাবি করেছি, কিন্তু আমাদের কাজ সব সময় আমাদের কথার বিপরীতেই গিয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণের বিপরীতে তাঁদের প্রতি কি নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে এবং তাঁদের সকলকে শহীদ হতে হয়েছে। এ কারণে পূর্বেই মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলের উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

যা হোক প্রকৃতপক্ষে সূরা শূরার এ আয়াতই হল আমাদের হেদায়াতের আলোকবর্তিকা, এটা আমাদের বুঝতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার বাণীকে কখনই যেন আমরা হালকাভাবে গ্রহণ না করি।

৮. রাসূলের সিদ্ধান্তের পূর্বে কথা না বলা

কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা বলার পূর্বে অন্য কারও কথা বলার কোন অধিকার নেই। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না, এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।'– সূরা হুজুরাত : ১

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন নর ও মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণের অধিকার থাকবে না।'– সূরা আহযাব : ৩৬

৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধিতার পরিণাম

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে নবী-রাসূলগণের আনুগত্যের আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের বিরোধিতা না করার ব্যাপারেও আদেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলের আনুগত্যের জন্য যেমন পুরস্কার রয়েছে তেমনি রাসূলের বিরোধিতা করলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। অর্থাৎ রাসূলের কথা মেনে চলা হেদায়াত, আর না মেনে চলা পথভ্রষ্টতা। রাসূলের বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত নিচে উল্লেখ করা হল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধিতাকারীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। মহান আল্লাহ্ বলছেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ كُبِتُوا۟ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে... ।'– সূরা মুজাদালাহ : ৫

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত ।'– সূরা মুজাদালাহ : ২০

পবিত্র কুরআনে রাসূলের বিরোধিতাকারীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে । যেমন :

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

'এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমালঙ্ঘন করবে তাকে তিনি (আল্লাহ) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং সে সেখানে চিরদিন (কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে) থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ।'– সূরা নিসা : ১৪

আরও বলা হয়েছে :

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

'এবং যে কেউ সঠিক পথ প্রকাশ হওয়ার পর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় চলবে তাকে আমরা সে যেদিকে ফিরে গেছে, সেদিকেই ফিরিয়ে দেব এবং (পরিশেষে) তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, আর তা অতিশয় নিকৃষ্ট পরিণাম ।'– সূরা নিসা : ১১৫

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

'যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।'– সূরা জিন : ২৩

মহান আল্লাহ্ আরও বলেছেন :

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য কর না, তোমাদের মধ্যে যারা অলক্ষ্যে সরে পড়ে আল্লাহ তো তাদের জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি।'– সূরা নূর : ৬৩

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟ أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত কর না এবং নিজেদের মধ্যে যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চৈঃস্বরে কথা বল না, তাহলে তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের আমলনামা বিনষ্ট হয়ে যাবে।'– সূরা হুজুরাত ১-২

অর্থাৎ কোন বিষয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করে নিজেরাই সিদ্ধান্ত দিতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাঁর সামনে নিচুস্বরে কথা বলার জন্য আদেশ

দেওয়া হয়েছে। আর এর বিপরীত হলে আমলনামা বরবাদ হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

১০. রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম

মহান আল্লাহ্ পছন্দ করেন না যে, কেউ তাঁর প্রিয় নবীকে কষ্ট দিক। রাসূলকে যারা কষ্টে নিপতিত করে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ রাগান্বিত হন। তিনি নিজে তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন। তাদেরও তিনি কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'– সূরা আহযাব : ৫৭

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِىَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۚ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

'তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে যারা এই রাসূলকে যাতনা দেয় এবং বলে : সে (নবী) বড় কর্ণপাতকারী। তুমি বল : (তার) কর্ণপাতকারী হওয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বিশ্বাসীদের (কথার) ওপর আস্থা রাখে, আর তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের জন্য অনুগ্রহস্বরূপ এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'– সূরা তওবা : ৬১

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدًا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

'তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, নিশ্চয় তার জন্য জাহান্নামের আগুন (প্রস্তুত) রয়েছে যার মধ্যে সে চিরকাল থাকবে; এটাই তো মহালাঞ্ছনা।'– সূরা তওবা : ৬৩

১১. কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধিতা প্রসঙ্গ

মহান আল্লাহ্র অসংখ্য নির্দেশ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ পালন না করা বা গড়িমসি করার অনেক নজির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাসূলের আনুগত্য না করা বা তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করার পারলৌকিক ক্ষতির কথা বাদ দিলেও শুধু পার্থিব জীবনেই অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে এ সংক্রান্ত অনেক বিবরণ রয়েছে যেগুলোর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। নিচে তেমনই কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হল।

ক. বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত : আবু সুফিয়ান ও আম্র ইবনুল আ'স কাফেলাসহ সিরিয়া (শাম) থেকে ব্যবসায়ের মালপত্র নিয়ে মক্কায় ফিরে আসছিল। ঐশীভাবে মহানবী (সা.)-কে এ সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হল। তিনি ৩১৩ জনের একটি ক্ষুদ্র সেনাদল নিয়ে রওনা হলেন। এ সংবাদ শুনে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে কাফিরদের সাহায্য চেয়ে পাঠাল। আবু জেহেল প্রমুখ মক্কার কুরাইশদের নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামসহ প্রায় এক হাজার জনের এক সৈন্যদল গঠন করে রওনা হল। এখানে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদের একটি দলের মনোভাব সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়।

كَمَآ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لَكَٰرِهُونَ ۝٥ يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ۝٦ وَإِذۡ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَى ٱلطَّآئِفَتَيۡنِ أَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ ٱلشَّوۡكَةِ تَكُونُ لَكُمۡ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٧

‘যেভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে বের করেছিলেন, অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। তারা তোমার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক করে তা প্রকাশিত হওয়ার পরও, যেন তাদের মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং (আক্ষেপভরা নয়নে) তারা তা প্রত্যক্ষ করছে। এবং যখন আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে, দু’টি দলের মধ্যে একটি তোমাদের হোক, আর তোমরা চাইছিলে নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের হোক এবং আল্লাহ নিজ বাণীর মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অবিশ্বাসীদের নির্মূল করতে চাইছিলেন।’– সূরা আনফাল : ৫-৭

খ. ওহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলমানদের সর্বপ্রথম বড় ধরনের ক্ষতি হয় ওহুদের যুদ্ধের সময়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়ের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন সৈন্যের একটি দলকে ওহুদ পাহাড়ের গিরিপথে নিয়োগ করেন। তিনি আদেশ দেন যে, যুদ্ধে জয় হোক বা পরাজয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যেন তাঁরা সে স্থান ত্যাগ না করেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন মুসলমানরা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে থাকে তখন গিরিপথে পাহারায় নিয়োজিত সৈন্যদের মধ্যে গনীমত লাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠে। তাঁরা তাঁদের দলপতির নির্দেশ অমান্য করে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে গনীমত সংগ্রহে লিপ্ত হন। ইবনে যুবায়ের সাধ্যমত বাধা দিলেন, তাদেরকে রাসূলের নির্দেশ স্মরণ করালেন, কিন্তু তারা শোনার পাত্র ছিল না। সাতজন ব্যতীত সকলে স্থান ত্যাগ করল। ফলে খালিদ বিন ওয়ালীদ ও ইকরামা ইবনে আবু জেহেল গিরিপথে আক্রমণ চালাল। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ শহীদ হয়ে গেলেন। কাফিরদের পুরো বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে পেছন দিক থেকে হামলা শুরু করল। ফলে যুদ্ধের অবস্থা পাল্টে গেল। হযরত হামযাসহ কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট

সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁত মুবারক ভেঙ্গে গেল। তাঁর শিরোস্ত্রাণ তাঁর মাথার মধ্যে গেঁথে যায়। সে সময় হযরত আলী, আবু দুজানা, হযরত নাসিয়া ও তাঁর স্বামীসহ কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাড়া সকলেই পালিয়ে যেতে থাকে। রাসূল (সা.) পলায়নরতদের ডাকলেও তাতে তারা সাড়া দিল না। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ (ওহুদ যুদ্ধেও) নিজ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেছিলেন, যখন তোমরা তাঁর অনুমতিক্রমে (প্রথম আক্রমণে) তাদের নিধন করছিলে; যতক্ষণ না তোমরা দুর্বলতা প্রদর্শন করলে এবং (রাসূলের নির্দেশের ব্যাপারে) পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলে এবং তার অবাধ্যতা করলে, যা তোমরা ভালবাস তা (গনীমত) তোমাদের দেখিয়ে দেওয়ার পর। তোমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইহকালের অভিলাষী ছিল এবং কতিপয় পরকালের অভিলাষী ছিল। অতঃপর (আল্লাহ) তোমাদেরকে তাদের (অবিশ্বাসীদের) থেকে ফিরিয়ে দিলেন (এবং তোমরা পলায়ন করলে); যাতে তিনি তোমাদের (বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা) পরীক্ষা করে নেন; এবং (এতদসত্ত্বেও) তিনি তোমাদের মার্জনা করলেন এবং আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (সে সময়কে স্মরণ করে লজ্জিত হও) যখন তোমরা (পাহাড়ের ওপর) আরোহণ করেই যাচ্ছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে কাউকে দেখছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদের পেছন থেকে তোমাদের আহ্বান করছিলেন। ফলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে এক শোকের পরিবর্তে আরেক শোক দিলেন, যাতে যা তোমাদের হাতছাড়া হয়েছে এবং যা (যে বিপদ) তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও;

আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' সূরা আলে ইমরান : ১৫২-১৫৩

গ. হুদায়বিয়ার সন্ধি সংক্রান্ত আয়াত : ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ১৪০০ সাহাবী নিয়ে উমরাহ করার জন্য মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মুশরিকরা তাঁদের বাধা দিতে পারে এ আশংকায় তাঁরা মক্কার তিন মাইল উত্তরে হুদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর কুরাইশদের সাথে আলোচনা করার জন্য তিনি প্রথমে হযরত উমরকে প্রেরণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হযরত উমর বলেন : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! মক্কায় বনী আদী ইবনে কাব গোত্রের এমন একটি লোকও নেই যারা আমাকে কুরাইশদের আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারে। আপনি বরং উসমান ইবনে আফ্ফানকে পাঠাতে পারেন।'[৮]

এরপর রাসূল হযরত উসমানকে প্রেরণ করেন। অনেক আলাপ-আলোচনার পর কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধির শর্তগুলো অনেক মুসলমানের কাছে অবমাননাকর মনে হওয়ায় তাঁরা তা মেনে নিতে পারেননি। এমনকি হযরত উমর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এভাবে প্রশ্ন করেন : 'আপনি কি আল্লাহ্র সত্য নবী নন? রাসূল বলেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তিনি বলেন, 'আমরা কি ন্যায়পথে ও আমাদের শত্রুরা অন্যায় পথে নয়?' রাসূল বলেন, 'নিশ্চয়ই।' তিনি আবার বলেন, 'তাহলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে কেন এত অপমান সহ্য করব?' রাসূল জবাব দেন, 'আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী।' হযরত উমর এরপর হযরত আবু বকরের কাছে গিয়ে একই রকম প্রশ্ন করেন। অনেক মুসলমানের অবস্থাই এর ব্যতিক্রম ছিল না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সন্ধির পর যখন সবাইকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলার এবং পশু কুরবানী করার নির্দেশ দেন তখন কেউই তাঁর সেই নির্দেশ পালন করেননি। এমনকি তিনি তিন বার এ নির্দেশ দিলেও মুসলমানদের একটি দল নিশ্চল হয়ে থাকেন। পরে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ্র পরামর্শে রাসূলুল্লাহ্ যখন নিজে মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন ও পশু কুরবানী করেন তখন মুসলমানরা তাদের কর্তব্য পালন করে।[৯]

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন রাসূল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখনই এ সন্ধিকে মুসলমানদের জন্য মহা বিজয় বলে অভিহিত করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়[১০] :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে মহা বিজয় দান করেছি।'– সূরা ফাত্হ : ১

উল্লেখ্য, হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, ইয়াহুদীদের শক্তিশালী কেন্দ্র খায়বার দুর্গ বিজিত হয় এবং পরিশেষে মক্কা বিজয়ের পথও সুগম হয়। এভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদের নানা দিক থেকে বিজয় অর্জিত হয়। এখানে আমাদের জন্য শিক্ষা হল এটাই যে, মহান আল্লাহ্র সব আদেশ-নিষেধ বা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সকল সিদ্ধান্তের মর্ম শতভাগ বোঝা সকলের পক্ষে সবসময় সম্ভব নয়। তাই তাঁর যেসব সিদ্ধান্তের মর্ম বোঝা যায় না সেসব সিদ্ধান্তও কোন রকম প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই মেনে নিতে হবে। আর এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যে সন্ধিকে মুসলমানরা অপমানজনক বলে মেনে নিতে পারছিল না সেই ঘটনাকে মুসলমানদের জন্য মহাবিজয় বলে ঘোষণা আমাদের সে শিক্ষাই দেয়।

ঘ. তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত : যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, রোমের সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হয়ে হেম্স পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন তখন তিনি সাহাবীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ জারি করলেন। তিনি মদীনা ও মক্কার চারপাশের এবং অন্যান্য অঞ্চলের সকল মুসলমানকে যুদ্ধের জন্য ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তীব্র গরম, রৌদ্রের প্রখরতা, খরার কারণে দুরবস্থা, সফরের দূরত্ব, মুসলমানদের সংখ্যাস্বল্পতা ও প্রতিপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রভৃতি কারণে কিছু সংখ্যক সাহাবী যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যহতি চেয়ে রাসূলের কাছে আবেদন করেন। এ সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সংঘবদ্ধ হয়ে বের হতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি আঁকড়ে ধর ও তোমরা কি পরকালের স্থলে (সাময়িক) পার্থিব জীবনে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? তবে (জেনে রাখ,) পার্থিব জীবনের উপকরণ পরকালের তুলনায় অতি কিঞ্চিৎ। এখন যদি তোমরা জিহাদে বের না হও, (তবে) আল্লাহ তোমাদের ওপর বেদনাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করবেন; এবং অপর কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কোন অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না; এবং আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।'– সূরা তওবা : ৩৮-৩৯

এ আয়াতদ্বয়ে যে কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। কিন্তু এরপরও তাঁর নির্দেশের বিরোধিতায় তিনি কখনও কখনও চরমভাবে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এমনই দু'টি ঘটনা নিচে বর্ণিত হল।

১. মহানবী (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত আমীরের বিরোধিতা : মুতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর পালিত পুত্র হযরত যায়েদকে অন্যতম সেনাপতি নিয়োগ করেন। কিন্তু মুসলমানদের মধ্য থেকে একদল তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং রাসূলের প্রতি আহ্বান জানায় যেন তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে সেনাপতি নিয়োগ করা হয়, যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'যদি তোমাদের ওপর কোন হাবশী ক্রীতদাসকেও আমীর নিয়োগ করা হয়, তবে তার আনুগত্য করবে।'

এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরিতে। এরপর একাদশ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের কিছুদিন পূর্বে মুসলমানরা একইভাবে তাঁর নিযুক্ত আমীরকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। শামের সীমান্তে রোমান সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উসামা বিন যায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁর অধীনে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমানসহ বড় বড় সাহাবীদের যুদ্ধে যাবার নির্দেশ দেন। কিন্তু মুসলমানদের একটি দল এবারও তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের এ বিরোধিতায় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়াতে সমালোচনা করছ, ইতিপূর্বে তার পিতার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ারও তোমরা সমালোচনা করেছ..।'[১১]

দুঃখের বিষয় হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথায় কেউ কেউ সাময়িকভাবে হযরত উসামা ইবনে যায়েদের নেতৃত্ব মেনে নিল বটে, কিন্তু রাসূলের ওফাতের পর আবার তারা হযরত আবু বকরের কাছে হযরত উসামার নেতৃত্ব পরিবর্তন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করল। কিন্তু তিনি রাসূলের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন।[১২]

প্রসঙ্গত একটি কথা স্বাভাবিকভাবে এসে যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক নিযুক্ত একটি মাত্র যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত সেনাপতিকে পরিবর্তন করার জন্য যদি মুসলমানরা রাসূলের ওফাতের পর এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শেষ অসিয়ত লেখার ক্ষেত্রে অন্তরায় : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর ওফাতের পূর্বে একটি বিষয় লিখিত আকারে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা তা লিখে নিতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। নবী (সা.)-এর রোগ যখন কঠিন হয়ে পড়ল, তিনি বললেন : 'আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন এক লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাবে না।' তখন কেউ একজন বললেন, নবী (সা.)-এর রোগ প্রবল হয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহ্র কিতাবই রয়েছে। সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এতে সাবাবিগণের মধ্যে মতভেদ হল এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'তোমরা আমার কাছ থেকে বের হয়ে যাও। আমার কাছে ঝগড়া করা উচিত নয়।'

এ প্রসঙ্গে বর্ণনাগত কিছু পার্থক্য সহ বেশ কয়েকটি হাদীস কেবল সহীহ আল বুখারীতেই বর্ণিত হয়েছে।[১৩]

অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামনে কণ্ঠ উচ্চকিত না করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرۡفَعُوٓاْ أَصۡوَٰتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجۡهَرُواْ لَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ أَن تَحۡبَطَ أَعۡمَٰلُكُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চকিত কর না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তার সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বল

না, তাহলে তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের আমলনামা বিনষ্ট হয়ে যাবে।'– সূরা হুজুরাত ১-২

প্রসঙ্গত এ আয়াতের শানে নুযূল উল্লেখ করা হল : আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। আল আকরা ইবনে হাবিস নবী (সা.)-এর নিকট এলে আবু বকর বলেন, হে রাসূলুল্লাহ্! তাকে তার গোত্রের কর্মকর্তা নিয়োগ করুন। উমর বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকে কর্মচারী নিয়োগ করবেন না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা উভয়ে নবী (সা.)-এর সামনে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর চরমে পৌঁছে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১৪]

যেখানে রাসূলের সামনে কাউকে কণ্ঠ উচ্চ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশের বিরুদ্ধে কথা বলার মত দুঃখজনক ঘটনাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস এ ঘটনার জন্য আফসোস করে বলতেন, 'আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁর লিখতে চাওয়ার মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতি একটা বিপদই বিপদ।' প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের মধ্যেই মুসলমানদের দুর্গতির কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন জন এ বিষয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমাদের এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত। আমরা অন্য কোন ব্যক্তির উম্মত নই যে, রাসূলের বিরোধিতায় তার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যে কোন অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

'এবং সে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কথা বলে না। (যা বলে) তা ওহী ব্যতীত (কিছু) নয় যা তার ওপর অবতীর্ণ হয়।'– সূরা নাজ্ম : ৩-৪

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহর পরিচিত অর্জনের পরও তাঁর আনুগত্য করা যেমন কঠিন, তেমনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচয় লাভের চেয়ে তাঁর অনুসরণ করা আরও কঠিন।

মহান আল্লাহ্কে চেনার পরও তাঁর আনুগত্য না করার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল ইবলীস। সে অনেক বছর আল্লাহ্র ইবাদাত করেছিল, কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্র আদেশ মানতেই অস্বীকার করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চিনে তাঁকে মেনে না নেওয়ার উদাহরণও পবিত্র কুরআনে এসেছে। মহান আল্লাহ্ বলছেন :

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡ

'যাদের আমরা গ্রন্থ দান করেছি তারা তাকে (এ নবীকে) সেরূপেই চেনে যেরূপে তারা নিজেদের সন্তানদের চেনে।'– সূরা আনআম : ২০

সূরা বাকারার ১৪৬ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে :

ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡرِفُونَهُۥ كَمَا يَعۡرِفُونَ أَبۡنَآءَهُمۡۖ وَإِنَّ فَرِيقٗا مِّنۡهُمۡ لَيَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١٤٦

'যাদের আমরা গ্রন্থ (তাওরাত প্রভৃতি) প্রদান করেছি তারা তাকে (রাসূলকে) সেভাবেই চেনে যেভাবে নিজেদের পুত্রদের চেনে এবং তাদের মধ্যে এক দল আছে যারা জেনে-বুঝে সত্য গোপন করে।'

নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের পরীক্ষায় অর্থাৎ মোবাহিলায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হল, কিন্তু তারপরও ইসলাম গ্রহণ করল না। কাফির-মুশরিকরাও রাসূলকে চিনেছিল, কিন্তু তাঁকে মেনে চলতে অস্বীকার করে। যেমন আবু জাহ্লের নাম ছিল আবুল হাকাম। কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে চেনার পরও গোঁড়ামিবশত তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নাম দেন 'আবু জাহ্ল'।

তাই আমাদের জন্য অবশ্যকর্তব্য হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যিকার পরিচয় অবগত হওয়া এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুসরণ করা। তবেই আমরা ইহকালে সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ করতে পারব এবং পরকালেও সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আজও যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্যের বিরোধিতা করে কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলছেন :

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾

'যারা অবিশ্বাসী হয়েছে এবং রাসূলের অবাধ্যতা করেছে, তারা সেদিন (কিয়ামতের দিন) এ কামনা করবে, হায়! যদি তাদের মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হত!'

মহান আল্লাহ্ আমাদের রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করে তাঁর আনুগত্য করার এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী যে কোন বিষয় থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন ।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৬২
২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭০৮
৩. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৪৮৪
৪. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৮০৭
৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭০৭
৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭১৪
৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭২৪
৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত আল ফারুক, পৃ. ১৪; মওলানা আকরাম খাঁ রচিত মোস্তফা চরিত, পৃ. ৪৭৭
৯. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ২৫৩১
১০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৯৪৩
১১. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৯১৯ ও ৪১১১
১২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮; আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হযরত আবু বকর (রা.), পৃ. ১১৫-১১৬
১৩. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১১২; ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪০৮২ ও ৪০৮৩; ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫২৫৮ ।
১৪. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩২০৪; আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৪৪৭৮

সিব্‌তে আকবার : ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

'মহান আল্লাহ্‌ তার (ইমাম হাসান মুজতাবা) মাধ্যমে আমার উম্মতের মধ্যে দু'দলকে সন্ধি করাবেন এবং তারা তার আশীর্বাদপূর্ণ অস্তিত্বের মাধ্যমে নিরাপত্তা, স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে।'- *রাসূলুল্লাহ (সা.)*

এক নজরে ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম : ৩য় হিজরির ১৫ রমযান, মঙ্গলবার অথবা বৃহস্পতিবার, পবিত্র মদীনা নগরী।

নাম : হাসান (তাওরাতে শুব্‌বার এবং ইনজীলে তাব্‌)

কুনিয়াত : আবু মুহাম্মাদ

লকব : মুজতাবা, তাইয়্যেব, সাইয়্যেদ, ওয়ালী, তাকী, হুজ্জাত, সিব্‌ত, কায়েম, ওয়াযির, আমীন।

আংটির ছাপ : আল ইয্‌যাতু ইলাল্লাহ্‌ (সম্মান আল্লাহ্‌রই জন্য)

প্রহরী : দু'ব্যক্তি মহান ইমামের প্রহরী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। একজনের নাম সাফিনা (রাসূলুল্লাহ্‌ সা.-এর গোলাম) এবং অন্যজনের নাম কায়েস ইবনে আবদুর রহমান।

ইমামত কাল : প্রায় ১০ বছর (৪০ হিজরির ২১ রমজান শুক্রবার তাঁর ইমামতকাল শুরু হয়)

আয়ুষ্কালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ইমাম হাসান (আ.) যে বছর ভূমিষ্ট হন তখন তাঁর মাতা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা. আ.)-এর বয়স ছিল ১২ বছর। তাঁর জীবনের প্রায় আট বছর কাটে নানা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে, আট বছরের কিছু বেশি সময় কাটে তাঁর মহীয়ষী মাতা হযরত ফাতেমা যাহরার সাথে, আর প্রায় ৩৭ বছর কাটে তাঁর মহান পিতা হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর সান্নিধ্যে। অতঃপর প্রায় ১০ বছর তাঁর ইমামতকাল ছিল। সব মিলিয়ে এ মজলুম ইমামের আয়ুষ্কাল ৪৭ থেকে ৫০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি : তিনি জীবনে ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্জ করেন, দু'বার নিজের সমুদয় সম্পদ গরীব ও ফকিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, দামেশকের অবাধ্য গভর্নর মু'আবিয়ার উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র ও স্বীয় সঙ্গীবৃন্দের সীমাহীন বিশ্বাসঘাতকতা ও অসহযোগিতার ফলে তিনি খেলাফত পদের ব্যাপারে আমীরে মু'আবিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মোতাবেক এ ঘটনা তাঁর ইমামত লাভের ছয় মাসের কিছু বেশি সময়ের মাথায় সংঘটিত হয়।

শাহাদাত : আমীরে মু'আবিয়ার প্ররোচনায় স্ত্রী জা'দা বিনতে আশআছ বিন কায়েস কিন্দী শরবতের সাথে বিষ মিশিয়ে তা ইমাম হাসান (আ.)-কে পান করতে দেয়। এর ঠিক ৪০ দিন পর অর্থাৎ ৫০ মতান্তরে ৫৩ হিজরির ২৮ সফর বৃহস্পতিবার এ মহান ইমাম শাহাদাত বরণ করেন। ইমামের জানাযা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রওজায় যিয়ারাতের জন্য নিয়ে গেলে হযরত আয়েশার বাধার মুখে এক অপ্রীতিকর অবস্থার অবতারণা ঘটে এবং এক পর্যায়ে ইমামের জানাযা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সেদিকে তীরবর্ষণ করা হয়। পরে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নির্দেশে জানাযাকে জান্নাতুল বাকী গোরস্তান অভিমুখে পরিচালিত করা হয় এবং সেখানেই দাফন করা হয়।

ইমামের সন্তানবর্গ : সাইয়্যেদ মুহসীন আমীনের মতে ইমামের ১৫ কন্যা এবং ৮ পুত্রসন্তান ছিল। তবে কোন কোন মুহাদ্দিস ইমামের সর্বমোট ১৫ জন সন্তান ছিল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ইমাম হাসান (আ.)-এর যিয়ারতের নামাযের নিয়ম : মোট দু'রাকাত নামায। প্রত্যেক রাকাতে সূরা হাম্‌দ পাঠের পর ২৫ বার সূরা তাওহীদ পাঠ করতে হয়। অতঃপর নামাযের সালাম ফিরিয়ে হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)-এর তাসবীহ পাঠ করতে হয়। অতঃপর যদি যিয়ারতকারী ইমামকে উসিলা করে আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে তাহলে ইনশা আল্লাহ্‌ তা পূরণ হবে।[১]

ভূমিকা

মদীনার আকাশ-বাতাস মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত (আ.)-এর উপস্থিতিতে সবসময় অদ্ভুত প্রাণবন্ত ও দ্যুতিময় ছিল। সত্যি কথা বলতে কী, এ শুষ্ক মরু শহরটি এর আগে কিম্বা পরে কখনই এরূপ মহীমার অধিকারী ছিল না। এর অলিগলি দিয়ে চলতে মজা ছিল। কারণ, প্রত্যুষ না হতেই এর আকাশ-বাতাস সুরভিত হয়ে উঠত মহানবী (সা.)-এর গায়ের বেহেশতী সুঘ্রাণে। এরকম এক নির্মল আনন্দঘন দিনে একটি সুসংবাদ মদীনার মুসলমানদের অন্তরে খুশির জোয়ার তোলে। মহানবী (সা.)-এর সিব্‌তে আকবার (জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র) ইমাম হাসান দুনিয়ায় এসেছেন।

সত্যি, মদীনা সেদিনের মত কখনই সুন্দর ছিল না। এতটা শান্তিময় ছিল না। কিন্তু সে সুন্দর দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মহানবী (সা.)-এর ওফাতের অব্যবহিত পর থেকেই এ সৌন্দর্য হারিয়ে যেতে থাকে। অচিরেই সে স্থান দখল করে নেয় এমন তিক্ততা, যা মদীনা কখনও দেখেনি। এ সময়ে ইমাম হাসান (আ.)-এর বয়স মাত্র আট বছর ছিল। তিনি হারালেন নানা রাসূল (সা.)-কে। আর খুবই সামান্য ব্যবধানে (৭৫ কিম্বা ৯৫ দিন) হারালেন প্রিয় মাতা ফাতেমা যাহরাকে। এরপর থেকে পিতা হযরত আলী (আ.) শহীদ হওয়ার সময় পর্যন্ত দীর্ঘদিন তিনি তাঁর পাশেই অতিবাহিত করেন। পৃথিবীর নিকৃষ্টতম অপরাধীর হাতে হযরত আলী (আ.)-এর নির্মমভাবে শাহাদাত লাভের পর এক ঝঞ্ঝাময় পরিবেশে ইমাম হাসান ইসলামী হুকুমাতের তরীর হাল ধরেন। ইমামের ছয় মাসের হুকুমাত এবং দশ বছরের ইমামতকাল এমন এক সময়ে ছিল যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থায় প্রথমবারের মত প্রকাশ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে আমীরে মু'আবিয়া মুসলিম জাহানকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিলেন। এমন এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, ইসলামের সত্যবাণী প্রচার করা

তো দূরের কথা, সত্যপন্থী মানুষের বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইমাম হাসান খেলাফতের মাত্র ছয় মাসের মাথায় অভাবনীয় এক প্রজ্ঞাময় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের উমাইয়্যা চক্রের সর্বনাশী প্রকোপ থেকে রক্ষা করেন। এ প্রবন্ধে আমরা এ মজলুম ইমামের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আলোচনা করব।

ইমাম হাসান মুজতাবা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র

মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে ইমাম হাসান (আ.)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। মহানবী (সা.)-এর কাছে ইমাম হাসানের মর্যাদা কত বেশি ছিল এ কথা শুধু সে যুগের মুসলমানরাই নয়, আজ অবধি সকল মুসলমান খুব ভালভাবেই জানে। প্রিয়নবী (সা.) তাঁর এ আদরের দৌহিত্রকে পিঠে তুলে নিতেন এবং দো'আ করতেন : 'হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি, তুমিও একে ভালবাস।' ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্ব স্ব সহীহ'র মধ্যে বর্ণনা করেছেন : ...বারা (রা.) বলেন :

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والْحسن بن عَلِي على عاتِقِهِ يقول اللهم إني أُحِبه فَأَحِبه.

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, হাসান ইবনে আলীকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে বলছেন : হে আল্লাহ্! আমি একে ভালবাসি। কাজেই তুমিও তাকে ভালবাস।'[২]

একই রকম আরও রেওয়ায়াত হযরত উসামা বিন যায়েদ এবং আবু হুরায়রা থেকেও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এ অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম হাসান (আ.)-এর সাথে শত্রুতা করার পরিণাম

ইমাম হাসান (আ.)-এর সাথে শত্রুতা করার কঠিন পরিণামের ব্যাপারেও সহীহ গ্রন্থসমূহে একাধিক রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে হিব্বান স্বীয় সহীহতে বর্ণনা করেছেন : যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত হয়েছে :

أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لِفَاطِمةَ والْحسن والْحسين أنا حرب لِمن حاربكُم وسلم لِمن سالمكُم.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনকে উদ্দেশ্য করে বলেন : 'আমি তার সাথে শত্রুতা করি, যে তোমাদের সাথে শত্রুতা করে। আর তার সাথে শান্তি বজায় রাখি যে তোমাদের সাথে শান্তি বজায় রাখে।'[৩]

হাকেম নিশাবুরিও তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা লিখেছেন : ...হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন :

نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (তাঁদের সকলের ওপর দরূদ ও সালাম) এর দিকে তাকিয়ে বলেন : 'আমি তার সাথেই দুশমনি করি, যে তোমাদের সাথে দুশমনি করে। আর তার সাথেই শান্তি বজায় রাখি যে তোমাদের সাথে শান্তি বজায় রাখে।'[৪]

শামসুদ্দীন যাহাবী 'সিয়ারু আ'লামুন নুবালা' গন্থে লিখেছেন : আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন :

نظر النبي (ص) إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم سلم لمن سالمكم.

নবী (সা.) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনের দিকে তাকিয়ে বলেন : 'আমি তার সাথেই দুশমনি করি, যে তোমাদের সাথে দুশমনি করে। আর তার সাথেই শান্তি বজায় রাখি যে তোমাদের সাথে শান্তি বজায় রাখে।'[৫]

হাকেম নিশাবুরী তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবান ইবনে তাগলিব এর সনদে আরও একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন : আবি সাঈদ বলেন :

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار.

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'যে ব্যক্তিই আমার আহলে বাইতকে ঘৃণা করবে, আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।'

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালও স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা থেকে একই রকম রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য সকল সূত্রে বণিত সহীহ হাদীস ও রেওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আহলে বাইত (আ.), যাঁদের অন্যতম হলেন ইমাম হাসান (আ.), তাঁদের সাথে শত্রুতা করা ও যুদ্ধ করার অর্থ হল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধে দুশমনি ও যুদ্ধ করা।

ইমাম হাসানের আরও কিছু পরিচয়

ইমাম হাসান বেহেশতের যুবকদের সম্রাট এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে চাদরের নিচে অবস্থানকারী আহলে বাইতের পাঁচজনের অন্যতম। এছাড়াও সকল মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, তিনি এবং আহলে বাইতের অন্যান্য সদস্য মুবাহালার ঘটনায় নাযিলকৃত আয়াত এবং তাতহীরের আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী পুতপবিত্র। আর ইমাম হাসান এজন্য গর্বও করতেন।[৬]

ইমাম হাসান ছিলেন নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চেহারার প্রতীম।[৭] আনাস ইবনে মালেক প্রমুখ বলেন যে, আহলে বাইতের সদস্যদের মধ্যে অন্য কেউ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এতখানি সদৃশ চেহারার ছিলেন না। তিনি ২৫ বার পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করেন, অথচ আকর্ষণীয় ঘোড়া তাঁর কাছেই ছিল।[৮] তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতা এতই প্রসারিত ছিল যে, তিনি 'কারিম-এ আহলে বাইত' বা আহলে বাইতের দয়াশীল উপাধিতে ভূষিত হন।[৯] তিনি তিনবার নিজের সমুদয় সম্পদ অর্ধেক করেন এবং দু'বার তা পুরোপুরি আল্লাহর রাহে দান করেন।[১০] তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর শরীর কেঁপে কেঁপে উঠত এবং তাঁর চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করত।[১১] আর ইমামের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এমন ছিল যে, তাঁর পরম শত্রুদ্বয় মু'আবিয়া ও মারওয়ান বলতেন : 'যেন পর্বতের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।'[১২]

ইমামত লাভের পূর্বে ইমাম হাসানের কিছু কর্মতৎপরতা

১. রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড :

ক. জঙ্গে জামালে (উটের যুদ্ধ) অংশগ্রহণের জন্য লোকজনকে সংগঠিত করা

অঙ্গীকার ভঙ্গ করে অবাধ্যতার পথে পা বাড়ানো বিচ্যুত মুসলমানদের দমন করার জন্য আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসানকে কুফায় প্রেরণ করেন। ইমাম হাসান মুজতাবাও তাঁর আকর্ষণীয় বাচনক্ষমতা প্রয়োগ করে বিশাল সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।

খ. জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণ

ইমাম হাসান জঙ্গে জামালে অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ও সাহসিকতাপূর্ণ অবদান রাখেন। এ যুদ্ধে হযরত আয়েশাকে বহনকারী উটকে হত্যা করার মাধ্যমে বিদ্রোহী দলের পরাজয় নিশ্চিত হয়। এ কারণেই একে 'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধ বলা হয়।

গ. সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং সেনাপতির দায়িত্ব পালন

এ যুদ্ধে ইমাম হাসান (আ.) হযরত আলী (আ.)-এর নির্দেশে দক্ষিণ বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি পিতার অধীনে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। শত্রুপক্ষের নেতা মু'আবিয়া উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমরকে প্রেরণ করেন যেন কোন প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিয়ে ইমাম হাসানকে রণাঙ্গণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু মু'আবিয়ার দূত নিঃরাশ হয়ে মাথা নিচু করে ফিরে আসে।

২. সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড

ক. কুফার জুমআ নামাযের অস্থায়ী ইমাম

হযরত আলীর খেলাফতকালে ইমাম হাসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্মতৎপরতা ছিল জুমআর নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন। যখনই হযরত আলী কুফা থেকে বাইরে যেতেন কিম্বা কোন কারণে জুমআর নামাযে ইমামতি করতে পারতেন না, তখন এ গুরুদায়িত্ব ইমাম হাসানের ওপরই ন্যস্ত করতেন।

খ. ইমাম আলী (আ.)-এর স্থলে বিচারকাজ পরিচালনা

বর্ণিত হয়েছে যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফতের সময়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল। তাকে একটি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি রক্তাক্ত লাশের পাশে পাওয়া গিয়েছিল, আর তার হাতে একটি চাকুও ছিল। বিচারের জন্য লোকটিকে হযরত আলীর কাছে আনা হল। তিনি তাকে বললেন : 'তোমার কি কিছু বলার আছে?' লোকটি বলল : 'হে আমীরুল মুমিনীন! এ অভিযোগ আমি মেনে নিলাম।' আলী (আ.) নির্দেশ দিলেন তাকে নিয়ে কিসাসের দণ্ড তার ওপর কার্যকর করতে। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল : 'তাকে ছেড়ে দাও, তাকে ছেড়ে দাও। সে কাউকে হত্যা করেনি। আমিই হত্যাকারী।' তখন আলী (আ.) অভিযুক্তকে জিজ্ঞেস করলেন : 'তুমি এ হত্যার অভিযোগ কেন মেনে নিলে, অথচ হত্যাকারী তো অন্যজন?' লোকটি উত্তর দিল : 'আমি এমন অবস্থায় ছিলাম না যে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতাম। কারণ, কয়েকজন লোক আমাকে চাকুহাতে ঐ লাশের পাশে দেখেছিল। আমি একটি দুম্বা জবাই করেছিলাম। অতঃপর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকেছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ঐ লাশটির রক্তে মাটি একাকার। আমি চমকে উঠলাম, আর এ লোকগুলোও সেখানে ঢুকে হাতে চাকু অবস্থায় আমাকে দেখে ফেলে। তারা মনে করল যে, আমিই হত্যা করেছি।' আলী (আ.) অভিযুক্ত লোকটি ও হত্যাকারীকে ইমাম হাসানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তিনিই এর বিচার করে রায় প্রদান করেন। ইমাম হাসান উভয়ের বক্তব্য শোনার পর রায় দিলেন : 'আসল হত্যাকারী তার সত্য স্বীকারের মাধ্যমে অভিযুক্ত লোকটির প্রাণ রক্ষা করেছে এবং যেহেতু সে পবিত্র কুরআনের 'আর যে (ব্যক্তি) কোন মানুষকে বাঁচায় সে যেন সকল মানুষকে বাঁচালো'[১৩]– এ আয়াতের আওতায় একজনকে হত্যা করার পর অপর একজনকে বাঁচিয়েছে, কাজেই দু'জনকেই ছেড়ে দাও। আর নিহতের রক্তমূল্য বাইতুল মাল থেকে পরিশোধ কর।'

৩. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড

ইমাম হাসান (আ.)-এর ইমামত লাভের পূর্বের উল্লেখযোগ্য একটি অর্থনৈতিক কর্ম হল সেসব জমির তত্ত্বাবধান করা যেগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.), হযরত আলী ও হযরত ফাতেমার পক্ষ থেকে ওয়াক্ফ হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সেগুলোর বেশিরভাগই

আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজী, ইয়াতিম, অনাথ ও আহলে বাইতের পরিবারবর্গের জন্য দেওয়া হয়েছিল। এসব সম্পত্তি মূলত খেজুর বাগান, ফসলি জমি, কুয়া, ভূগর্ভস্থ পানির নালা ইত্যাদি রূপে ছিল।

পিতার শাহাদাতের পর ইমাম হাসান

ইমামুল মুত্তাকীন আলী ইবনে আলী (আ.)-এর মজলুমভাবে শাহাদাত বরণের পর জনগণের মধ্য থেকে একদল ইমাম হাসানের কাছে উপস্থিত হয়ে বলে : 'হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্তান! আপনি হলেন খলীফা এবং আপনার পিতার স্থলাভিষিক্ত। আমরা সবাই আপনার নির্দেশ মান্য করার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং আপনি যেভাবে কল্যাণ মনে করেন, সেভাবেই আমাদের পরিচালিত করুন।' জবাবে ইমাম তাদের বললেন : 'তোমরা মিথ্যাবাদী জনগণ। কারণ, যে মানুষ আমার চেয়ে শ্রেয়তর ছিল তাঁর সাথেই তোমরা বেঈমানী করেছ। সুতরাং কিভাবে তোমরা আমার নির্দেশ মান্য করবে? আর আমিও কোন্ ভরসায় তোমাদের ওপর আস্থা রাখব? তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমাদের সাথে আমার কথা থাকল মাদায়েন শহরের নিকট পরস্পর দেখা হবে। সেখানেই সবাই দুশমনের মোকাবিলা করার জন্য সমবেত হব।' তখন তাদের অধিকাংশই ইমাম হাসানের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল। ইমাম সব অবস্থা অবগত হয়ে নিজের সওয়ারীর ওপর সওয়ার হলেন এবং কিছু সংখ্যক সঙ্গী নিয়ে রওনা হলেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশে এক ভাষণে বলেন : 'হে লোকসকল! তোমরাই আমাকে ধোঁকা দিতে চেয়েছ, ফলে ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছ, যেমনটি করেছ আমার পিতার সাথে। তোমরা আমার পরে এক কাফের ও যালেম ব্যক্তির নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে, যার আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান বলতে কিছুই নেই।'

এরপর ইমাম হাসান কিন্দী নামের এক ব্যক্তিকে সেনাদলের অধিনায়ক নির্বাচিত করে চার সহস্রাধিক সৈন্যসহ রণাঙ্গণে প্রেরণ করেন এবং বলেন : 'আম্বার নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করবে। আমার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেখান থেকে নড়বে না।'

মু'আবিয়া যখন এ ঘটনার কথা অবগত হলেন, তখন পাঁচ লক্ষ দিরহামসহ কয়েকজন অনুচরকে ইমামের সেনাধিনায়কের কাছে প্রেরণ করলেন। তাদের মাধ্যমে এ বার্তা পৌঁছালেন : 'যদি তুমি আমাদের সাথে যোগ দাও তাহলে যে প্রদেশেরই গভর্নর হতে চাও, তোমাকে সে প্রদেশের গভর্নর করা হবে।' ইমামের সেনাধিনায়ক যেহেতু দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও দুনিয়ালোভী ছিল, সেহেতু সে ইমাম হাসানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে উক্ত দিরহামগুলো গ্রহণ করে অনেক সৈন্যসহ মু'আবিয়ার দলে যোগ দিল।

যখন এ খবর ইমাম হাসানের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বলেন : 'হে লোকসকল! কিন্দী আমার প্রতি ও তোমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং আমি দ্বিতীয়বারের মত পুনরাবৃত্তি করছি যে, তোমরা হলে অবিশ্বস্ত ও দুনিয়ালিপ্সু। কিন্তু আমি অন্য একজনকে তার জায়গায় প্রেরণ করছি। যদিও আমি জানি যে, সেও আগের লোকটির মতই বিশ্বাসঘাতক।' অতঃপর ইমাম মুরাদ গোত্রের মুরাদি নামের এক লোককে চার হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করলেন এবং তার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যেন সে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সেও কসম করল যে, সে পর্বতের মতই অবিচল ও অটল থাকবে। অতঃপর যখন সে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি হল তখন ইমাম নিচুস্বরে বললেন, 'এর ওপরও কোন ভরসা নেই।'

যখন মুরাদির সৈন্যদল আম্বার-এ পৌঁছল, তখন মু'আবিয়া পুনরায় কিন্দীর মত একই পরিকল্পনা কার্যকর করল এবং সেও ধোঁকার শিকার হল। আর নিজের অঙ্গীকার ও কসম ভঙ্গ করে মু'আবিয়ার দলে যোগ দিল। ইমাম হাসান (আ.) মুরাদির বিশ্বাসঘাতকতার খবর শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং বললেন : 'আবারও বলছি যে, তোমাদের মধ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা নেই। তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। নিজের চোখেই দেখলে যে, কিন্দী ও মুরাদি কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল!' কিন্তু উপস্থিত লোকেরা বলল : 'হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্তান! তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বটে, কিন্তু আমরা সততার সাথেই আপনার সাথে আছি। আপনি যা নির্দেশ দান করবেন, সেটাই মেনে চলব।' ইমাম হাসান বললেন : 'তাহলে তোমাদের আরও একবার পরীক্ষা করে দেখি যাতে সত্য তোমাদের নিজেদের জন্য প্রমাণিত হয়ে যায়। তোমাদের সাথে আমার ওয়াদা রইল নুখাইলা ভূখণ্ডে। যে কেউ চায়, সেখানে হাজির হবে। যদিও আমি জানি, তোমরা ওয়াদা ভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতক।'

অতঃপর ইমাম নুখাইলা ভূখণ্ডে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে দশ দিন অবস্থান করলেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, গুটিকতক লোক ছাড়া সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত হয়নি। তখন ইমাম কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মিম্বারে আরোহণ করে এক ভাষণে বললেন : 'আমি আশ্চর্য হই তোমাদের মত নিকৃষ্ট, বে-দীন ও অবিশ্বাসী লোকদের থেকে। ধিক তোমাদের! এমন সস্তা প্রতারণার শিকার হওয়া ও আত্মবিক্রিত লোকেরা! জেনে রেখ, ইসলামী হুকুমত বনি উমাইয়্যার ওপর হারাম। কিন্তু যদি হুকুমত মু'আবিয়ার হাতে পড়ে, তাহলে যেহেতু তোমাদের তার হুকুমতের বিরোধিতাকারী হিসেবে জানবে, ফলে সামান্যতম দয়াও তোমাদের প্রতি দেখাবে না; বরং নিষ্ঠুরতম পন্থায় তোমাদের নির্যাতন চালাবে এবং তোমাদের ধ্বংস করবে।'

কুফার অনেক বিশ্বাসঘাতক ও দুনিয়াপূজারি লোক ইমামের এসব কথা চিঠি লিখে মু'আবিয়াকে জানায়। চিঠিতে তারা লেখে : 'যদি আপনি আগ্রহী থাকেন তাহলে আমরা হাসান ইবনে আলীকে গ্রেফতার করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে রাজি আছি।'

যখন তারা এ ব্যাপারে মু'আবিয়ার সন্তুষ্টির কথা অবগত হল, তখন তারা ইমাম হাসানের আবাসস্থলে হামলা করল এবং তরবারির আঘাতে তাঁর পবিত্র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করল।

এ ঘটনার পরে ইমাম নিরূপায় হয়ে মু'আবিয়ার কাছে এ মর্মে একটি পত্র লেখেন : 'যদিও আমার নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, খেলাফত ও বেলায়াত বনি উমাইয়্যার ওপর হারাম, কিন্তু যে অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, নিরূপায় হয়ে আমি কিছু শর্তসাপেক্ষে সন্ধির জন্য প্রস্তুত আছি।'[১৪]

ইমাম হাসানের সাথে উমাইয়্যা ও আব্বাসীদের বিরোধিতার ঐকমত্য

ইমাম হাসান (আ.)-এর রাজনৈতিক জীবন এমন সব জটিলতায় ভরা যা এমনকি কোন কোন গবেষককে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। এ কারণে তাঁদের মধ্যে কমসংখ্যক ব্যক্তিই সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম হয়েছেন।

ইমাম হাসান সম্পর্কে মুসলমানদের ইতিহাসের সকল সূত্রে বর্ণিত হাদীস ও রেওয়ায়াতগুলো বিকৃতি ও তাঁর দুশমনদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কবলে পড়েছে।

যেহেতু ইমাম সবসময় উমাইয়্যাদের সাথে মোকাবিলায় লিপ্ত ছিলেন সেহেতু তাদের, বিশেষ করে মারওয়ানের হিংসা ও বিদ্বেষের মুখে ছিলেন। তাছাড়া সিফফিনের যুদ্ধকালীন সালিশের মতই চাপিয়ে দেওয়া এক সন্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে উমাইয়্যারা ক্ষমতার ময়দানে নিজেদের একচেটিয়া দৌরাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সুযোগে তারা ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে আরও দু'টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের অশুভ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর মধ্যে একটি হল ইমামকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার পর ইমামের ব্যক্তিত্ব ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা। আর অন্যটি হল চূড়ান্ত পর্যায়ে ইমামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া।

ইমাম হাসানের ব্যক্তিত্বকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য তারা প্রথমে প্রচারণা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে শুরু করে। আর এ চেষ্টা সফল হলে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করার কাজটি সহজ হয়ে যাবে। অপরদিকে, আব্বাসীদের উত্থানের পরে যখন তাদের শাসনক্ষমতা পূর্ব থেকে পশ্চিমের সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করেছিল, এ সময়ে ইমাম হাসানের বংশধরদের বিভিন্ন আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ায় আব্বাসীরাও উমাইয়্যাদের মতই তাঁদেরকে দুর্বল করার লক্ষ্যে তাঁদের পূর্বপুরুষ ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে থাকে। ফলে রেওয়ায়াতের নামে ইমাম হাসানের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থসমূহে এগুলো এমনভাবে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে যে, একজন সরলমনা মুসলমান সেগুলো পাঠ করলে তার মনে এ মহান ইমামের প্রতি শুধুই কুধারণা ও ঘৃণাই জন্ম নেবে। শুধু তা-ই নয়, আজ দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যের অনেক প্রাচ্যবিদ যখন ইমাম হাসানের রাজনৈতিক জীবনের ওপর বিশ্লেষণ লেখেন তখন ঐসব বানোয়াট রেওয়ায়াতকেই তাঁদের লেখনীর মধ্যে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরা যেহেতু আহলে বাইতের অনুসারীবৃন্দের মূলধারার সাথে পরিচিত নন, অপরদিকে উমাইয়্যাদের এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বানোয়াট রেওয়ায়াতে পরিপূর্ণ ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থগুলোকেই তাঁরা সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন, ফলে এসব বানোয়াট ও অমূলক বর্ণনা দ্বারা অনায়াসে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং ইমাম হাসান (আ.) সম্পর্কে নিকৃষ্টতম মন্তব্য করতেও তাঁরা দ্বিধা করেন না। ফরাসি প্রাচ্যবিদ Le Mans (১৮৭২-১৯৫৬) এর মত লেখকবৃন্দের নাম এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য, যাঁদের লেখা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীবাদের অনেক সেবায় এসেছে।[১৫]

এসব লেখনী, সেটা ইতিহাস গ্রন্থেই হোক অথবা প্রাচ্যবদিদের লেখনীতে, নিম্নোক্ত দু'টি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে :

১. ব্যক্তিত্ব হনন ও

২. রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা ।

স্মর্তব্য যে, দীনি হুকুমতসমূহে হুকুমত লক্ষ্য নয়; বরং তা মানুষের পার্থিব ও আখেরাতের কল্যাণ সাধনের জন্য একটি উসিলা মাত্র । এ কারণে শাসকরা নিজেরা যেমন সৎকর্মপরায়ণ হন, তদ্রূপ সৎকর্মপরায়ণদেরই জনগণের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন । বিপরীতক্রমে ধর্ম বহির্ভূত হুকুমতসমূহে যেহেতু লক্ষ্য হল ক্ষমতায় পৌঁছানো– সেটা যে কোন উপায়েই হোক না কেন, তাই যে কোন কাজ করতে তারা দ্বিধা করে না । এরূপ একটি কার্যকর পদক্ষেপ হল সমাজের জন্য ব্যক্তিত্ব বানানো এবং ব্যক্তিত্ব ধ্বংসের নীতি । তারা নিজেদের সাথে সমাজকে একই পথের পথিক করে তোলার জন্য চেষ্টা করে । তারা প্রচারণার মাধ্যমে তাদের পছন্দের ব্যক্তিবর্গকে তুচ্ছ থেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মহান করে তোলে এবং তাদের মধ্য থেকেই ফকীহ, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, কারী, আলেম, রাজনীতিক ইত্যাদি বানায় । বিপরীতক্রমে অপপ্রচার চালিয়ে শ্রদ্ধাবান ও সঠিক আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিত্বদের মূল্যহীন ও তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত করে যাতে তাদেরকে জনগণ ও সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে । আর এ কারণেই বলা যায়, সমাজের সংস্কারক ও যোগ্য নেতাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে মোক্ষম হাতিয়ার হল তাদের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করে দেওয়া । রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কঠিন দুশমন ও মুনাফিকরা যখন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে তখন নবীপত্নীর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ আরোপ করার মাধ্যমে মহানবীর সাথে তাদের কঠিন শত্রুতার পরিচয় দেয় । তদ্রূপ উমাইয়্যারা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপবাদ আরোপ করতে দ্বিধা করেনি । স্বয়ং মু'আবিয়ার ভাষায়, এ অপপ্রচারের ভিত্তিতে বড় থেকে বড়রা এবং ছোট থেকে ছোটরা মৃত্যু অবধি ঘুরপাক খেতে থাকবে ।[১৬]

এ একই ধারাবাহিকতায় ইমাম হাসানের দুশমনরাও তাঁকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় অঙ্গনে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এবং ঘৃণ্য অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করতে থাকে । এক্ষেত্রে এ শ্রেণীর লেখক ও ঐতিহাসিকদের জন্য যে বিষয়টি

আরও সুবিধা করে দেয় সেটা হল মু'আবিয়ার সাথে ইমাম হাসান (আ.)-এর সন্ধির ঘটনা।

অথচ সেই সময়ের ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে কিছুটা হলেও অধ্যয়ন করলে সন্ধি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁর প্রজ্ঞাময় সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়। এটি তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা তো নয়ই; বরং এটি তাঁর উচ্চ রাজনৈতিক মেধারই সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার এক দশক পরে যখন রাজন্যদের খেয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) প্রকাশ্য রূপ লাভ করে তখন সকলেই ইমাম হাসান (আ.)-এর সন্ধির সঠিকত্ব ও গভীরতার ব্যাপারে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় এবং তা অকপটে স্বীকার করতে থাকে।

এ সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার অনেক বছর আগেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন : 'নিশ্চয় হাসান হল আমার সুগন্ধী ফুল এবং আমার এ সন্তান হল সাইয়্যেদ ও মহান। অচিরেই মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে দু'দল মুসলমানের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন এবং তারা তার আশীর্বাদপূর্ণ উপস্থিতির মাধ্যমে নিরাপত্তা, স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে।'[১৭] এ রেওয়ায়াতটি এবং ইতিহাসের ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্লেষণ বিদ্বেষী লেখকদের 'ব্যক্তিত্ব ধ্বংসের' ঘৃণ্য প্রয়াসের মুখোশ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদিও এর বাইরেও মহান ইমামের জ্ঞানগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে, যেগুলো প্রত্যেকটিই তাঁর পুত-পবিত্র ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণের এক একটি সনদ হতে পারে। ইসলামী শিক্ষার পাঠদান, উপযুক্ত শিষ্যবৃন্দ প্রতিপালন– যাঁরা কঠিনতম পরিস্থিতিতেও মুসলিম বিশ্বের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস হতে পারেন, নবীর হাদীস বর্ণনা, গঠনমূলক ও ভাগ্যনির্ধারণী বিচার কাজ পরিচালনা– এরূপ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে ইমাম হাসান মুজতাবা যে মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তা কেবল তাঁর ব্যক্তিত্বকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য গবেষক ও মুসলমানদের সাহায্যই করবে না; বরং একটি চিন্তাশীল সমাজ গঠনেও যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

আরেকটি বিষয় হল, সব গোত্র বা জাতির জীবনে তাদের অতীত ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে সুলিখিত ইতিহাস যেমন একটি জাতির উজ্জীবিত জীবন গড়তে অনুপ্রেরণা যোগায়, বিপরীতক্রমে কোন পক্ষপাতদুষ্ট এবং অসত্য ও বিকৃত ইতিহাস একটি জাতিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত

করে। পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও মহান মুসলিম জাতির ইতিহাস একদিকে যেমন গৌরবের আলোয় উদ্ভাসিত, একইভাবে আবার অযাচিত হস্তক্ষেপে অনেক সত্যই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের মুসলমানদের কাছে চাপা পড়ে রয়েছে। এরূপ একটি চাপা পড়া ইতিহাস হল ইমাম হাসান (আ.)-এর খেলাফতকাল। আমীরে মু'আবিয়ার নেতৃত্বে তৎকালীন উসমানীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া আজকের যেসব ইতিহাস, তার একটি পরিচয় হল ইমাম হাসানের ছয় মাসের খেলাফতকালের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করা বা তা অস্বীকার করা। ইমাম হাসানের এ খেলাফতকালকে না খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে গণ্য করা হয়, আর না কোন মানবীয় যুগের মধ্যে গণ্য করা হয়। আসলে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এ খেলাফতকে তেমন স্বীকৃতি প্রদান করা হয় না। অথচ সেদিন অবশিষ্ট মুহাজির ও আনসার যাঁরা কুফায় ছিলেন, তাঁরা ছাড়াও ইরাকের জনগণ এবং ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের বাসিন্দারা সকলে ইমাম হাসান (আ.)-কে মুসলমানদের খলীফা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে বিশাল এক ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। আবার এ সময়েই মু'আবিয়া শামে খেলাফাতের দাবিদার ছিলেন। যদিও তাঁর নিজের কথা অনুযায়ী আনসারদের মধ্য থেকে শুধু একজন ব্যক্তিই তাঁর সাথে ছিল।

খেলাফতের ইতিহাসে একই সময়ে দু'জন খলীফা থাকার বিষয়টির কোন স্থান নেই। যে সময়ে ইমাম হাসান (আ.) খেলাফতে আসীন হন, তখন শামের তুলনায় ইরাকের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। একদিকে সিফফীন যুদ্ধোত্তর সালিশী ফয়সালায় ইরাকের জনগণের ক্ষতি হয়, এর পাশাপাশি খারেজীদের বিদ্রোহও ইরাকের শক্তিকে প্রচণ্ডভাবে দুর্বল করে দেয়। তারা পরপর তিনটি যুদ্ধের (জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফিন ও জঙ্গে নাহরাওয়ান) কারণে পরিশ্রান্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।

ইমাম আলী (আ.)-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে যতই জনগণকে বলা হল সংঘবদ্ধ হতে, খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই তাতে সাড়া দিল। এবার ইমাম আলীর শাহাদাতের পরে এবং শামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ইরাকবাসীর সীমাহীন উৎকণ্ঠার কারণে আশা করা হচ্ছিল যে, তারা একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একতাবদ্ধ হবে। আর তাদের এ কাজের পথে একজন ইমাম (বা নেতাকে) বেছে নিবে এবং যেমনটা ইশারা করা হল, তাদের ইমামকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কায়েস ইবনে সা'দ এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বাইআতও ইমামের সাথে

ইরাকের জনগণের বাইআত হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যে পথ অনুসরণ করে হিজাজের জনগণও কিছু সময় নিয়ে বাইয়াতে প্রবৃত্ত হয়।

আসলে কুফাবাসীর অধিকাংশের প্রবণতা ছিল ইমাম আলী (আ.)-এর সরকারকে সমর্থন করা। আলী (আ.)-এর শাহাদাতের পরে তারা ইমাম হাসান (আ.) ব্যতীত আর কাকে নির্বাচিত করতে পারত? অবশ্য মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে, এমনকি কুরাইশদের মধ্যে কোন কোন সাহাবী কুফায় ছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ন্যায় ব্যক্তিও কুফায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইমাম হাসানকে নির্বাচনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি এবং অন্য কোন ব্যক্তির নাম সামনে আসেনি। তবে এটা এ কারণে নয় যে, ইরাকের জনগণ হাসান ইবনে আলীকে তাঁর পিতার চেয়েও বেশি ভালবাসত; বরং এর কারণ ছিল যে, এটা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না।

এ আলোচনা অবতারণা করার কারণ হল যাঁরা বলতে চান, ইমাম হাসান (আ.)-এর সময় সকল পরিস্থিতি তাঁর অনুকূল থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছায় চাননি যুদ্ধ ও হানাহানির পথ অব্যাহত রাখতে, এ কারণে খেলাফতও ছেড়ে দেন। কিন্তু এ বক্তব্য কখনই সঠিক নয়। এ প্রবন্ধে ইমাম হাসানের সন্ধিচুক্তি বিশ্লেষণ করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নেই। তবে যাঁরা উক্ত সন্ধিচুক্তির প্রেক্ষাপট ও চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে জানেন, তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ইমাম হাসান খলীফা এবং ইমাম হিসাবে সেদিন কী বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন! এমনকি এ প্রসঙ্গে আহলে বাইতের অনুসারীবৃন্দের সূত্রে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যে, ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) স্বীয় পুত্রকে খেলাফতের জন্য নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ঘোষণা করে যান। যদিও আহলে সুন্নাতের সূত্রগুলো সেগুলোকে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত বলে উল্লেখ করেনি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে একটি রেওয়ায়াত অনেকগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়াতটি হল :

الحسن و الحسين امامان، قاما او قعدا

'হাসান ও হুসাইন দু'জন ইমাম, তারা উঠে দাঁড়ালেও অথবা বসে থাকলেও।'[১৮]

এ হাদীসের বক্তব্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এ দু' ভাইয়ের ইমামতের বিষয়টি সুঘোষিত একটি ব্যাপার। নাস্‌র বিন মুযাহিমের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আলী (আ.)-এর আমলেই আওয়ার শান্নি ইমামকে উদ্দেশ করে বলেন : 'আল্লাহ্ আপনার সাফল্য

বৃদ্ধি করুন, আপনি খোদায়ী নূরের আলোক ছায়ায় দৃষ্টিপাত করেন... আপনি হলেন নেতা (ইমাম) এবং যদি আপনি নিহত হন তাহলে আপনার পরে নেতৃত্ব এ দু'জনের (হাসান ও হুসাইন) ওপর ন্যস্ত হবে। আমিও এ সম্বন্ধে কিছু রচনা করেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে শুনতেন :

হে আবুল হাসান! আপনি হলেন মধ্যাহ্নের আলোকবর্ষী সূর্যসম,
আর এ দু'জন (আপনার পুত্রদ্বয়) সৃষ্টিকুলের মাঝে কিরণময় চন্দ্রসম
আপনি এবং এ দুই তরুণ শেষ মুহূর্ত অবধি কর্ণ ও চক্ষুর ন্যায়
সঙ্গের সাথী এবং একাদিক্রমে পরস্পর,
আপনারা পুণ্যকর্মী, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যেখানে
মানব প্রজন্মের নাগাল ছুঁতে পারে না সে সম্মান।

মুনযির বিন জারুদও সিফফিনে ইমাম আলী (আ.)-কে বলেন :

فان لك فهذان الحسن و الحسين أئمتنا من بعدك

'যদি আপনি নিহত হন, তাহলে এ দু'জন অর্থাৎ হাসান ও হুসাইন হবেন আপনার পরে আমাদের ইমাম।'

তিনি একটি কবিতায় বলেন :

اباحسن أنت شمس النهار
و أنت و هذان حتي الممات
و هذان في الداجيات القمر
به له السمع بعد البصر

'আবুল হাসান, আপনি হলেন দ্বি-প্রহরের উজ্জ্বল সূর্য
আর আপনি ও এ দু'জন (একসাথে), মৃত্য পর্যন্ত
এরা দু'জন কিরণময় চন্দ্রসম
চক্ষুর পরে কর্ণ যেমন।'

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আলী (আ.)-এর শাসনকাল থেকেই ইমামের সঙ্গীরা তাঁর পরের নেতৃত্ব হাসান ও হুসাইন (আ.)-এর অধিকারে বলে জানত। এ

কারণেই আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) শাহাদাত বরণ করার পর আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস জনগণকে ইমাম হাসানের দিকে আহ্বান করেন এবং বলেন : 'তিনি তোমাদের নবীর সন্তান এবং তোমাদের ইমামের ওয়াসী। কাজেই তাঁর হাতেই বাইআত কর।' ইমাম হাসানও একটি পত্রে আমীরে মু'আবিয়াকে উদ্দেশ করে লেখেন : 'যখন আমার পিতা মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপনীত হন, তখন এ দায়িত্ব তাঁর পরবর্তীকালে আমার ওপর সোপর্দ করেন।' হায়ছাম বিন আদি তাঁর একাধিক মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা বললেন, হাসান ইবনে আলী তাঁর পিতার 'ওয়াসী' ছিলেন। আবুল আসওয়াদ দুয়ালিও, যিনি বসরায় ছিলেন তিনি ইমামের বাইআত গ্রহণের সময়ে বলেন : 'তিনি দরজা– সদর দরজা দিয়েই ওয়াসী ও ইমামত লাভ করেছেন।' তদ্রূপ সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকেও বলা হয় : 'আপনি হলেন আপনার পিতার ওয়াসী ও খলীফা। আমরা আপনার আনুগত্যকারী।'

মোটকথা, এ বিষয় মেনে নেওয়া যায় যে, হযরত আলী (আ.) তাঁর পুত্রকে সেই ব্যক্তিরূপে উপস্থাপন করেছেন যাঁকে তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গ্রহণ করেন। তাই দেখা যায়, ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর সর্বপ্রথম ভাষণে তিনি বলেন : 'যে আমাকে চেনে সে তো চেনেই। আর যে চেনে না (সে জেনে রাখুক), আমি হলাম হাসান, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্তান। আমি হলাম সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারীর সন্তান। আমি হলাম আল্লাহ্র দিকে তাঁরই অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোর সন্তান। আমি হলাম এমন আহলে বাইত থেকে, যাঁদের থেকে মহান আল্লাহ্ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতা দূর করেছেন এবং তাঁদের পুত-পবিত্র করেছেন। যাঁদের ভালবাসা আল্লাহ্ স্বীয় কিতাবে ওয়াজিব করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে : 'বলুন, আমি রিসালাতের পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে কিছুই চাই না, শুধু আমার নিকটাত্মীয়ের ভালবাসা।'[১৯] 'আর যে পুণ্যের কাজ করবে, আমি তার পুণ্য বৃদ্ধি করে দিই।'[২০] অতএব, পুণ্যের কাজ হল, আমার আহলে বাইতকে ভালবাসা।' ঐতিহাসিক মাসউদি[২১] ইমাম হাসান (আ.)-এর এ সংক্রান্ত একটি ভাষণের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'আমরা আল্লাহ্র দল সফলকাম। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটতম ইতরাত (আত্মীয়), আমরা হলাম পুতপবিত্র আহলে বাইত এবং সাকালাইন (দু'টি ভারী বস্তু)-এর একটি, যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তোমাদের মধ্যে রেখে গেছেন এবং এর অন্যটি হল আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে কোন দিক থেকেই বাতিলের কোন পথ নেই।... কাজেই আমাদের আনুগত্য কর, আমাদের

আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করার সাথে যুক্ত রয়েছে উলিল আমরের আনুগত্য। অর্থাৎ যদি কোন বিষয়ে বিবাদ কর, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের কাছে নিয়ে যাবে... আর যদি রাসূল ও উলিল আমরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁরা যেহেতু জ্ঞানের অবধারণকারী, কাজেই তা জানবে...'

হেলাল বিন ইয়াসাফ বলেন : 'আমি হাসান বিন আলীর ভাষণ শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন : হে কুফার জনগণ! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ থেকে ভয় করবে, আমরা হলাম তোমাদের আমীর ও তোমাদের অতিথি। আমরা এমন আহলে বাইত যে, আল্লাহ্ আমাদের সম্পর্কে বলেছেন :

«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا».

'আল্লাহ্ তো চান তোমাদের থেকে সকল অপবিত্রতা দূর করতে, হে আহলে বাইত! এবং তোমাদের পুতপবিত্র রাখতে।'[২২]

সম্ভবত এ ভাষণটি ইমাম হাসান (আ.) সাবাত-এ আহত হওয়ার পর প্রদান করেছিলেন।

উপসংহার

অনেক ঐতিহাসিক ও হাদীসবিদ বর্ণনা করেছেন যে, একদিন ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.) একদল সঙ্গী-সাথীর মাঝে কয়েকটি সাপকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং সেগুলোকে একটার পর একটা হাতে তুলে নিলেন। সেগুলো ইমামের হাতের কব্জি থেকে পেঁচিয়ে গলার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অতঃপর ইমাম সেগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছিলেন যাতে চলে যায়। এমন সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের বংশের একজন লোক, যে ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিল, সে বলল : 'এটা তো কোন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাপার নয়। এরূপ কাজ আমিও করতে পারি।' একথা বলে সেও একটি সাপ তুলে নিল এবং তার হাতে পেঁচাতে চাইলো। হঠাৎ করে সাপটি তাকে দংশন করল। ফলে সেই লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।'[২৩]

ইমাম হাসান মুজতাবা (আ.)-এর হাত থেকে এক প্রতারণামূলক সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে মুসলিম জাহানের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে কি আমীরে মু'আবিয়ারও একই পরিণতি হয়েছিল?

তথ্যসূত্র

১. আবদুল ওয়াহাব, আশ-শিয়া, ১ম খণ্ড; তাবারী, দালায়িলুল ইমামাহ্; ইবনে শাহর আশুব, আল মানাকিব; হুসাইন বিন জামাল আল উসবু, উয়ুনুল মু'জিযাত; শেখ তূসি, তাহযিবুল আহকাম; আল্লামা মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ ও ৪৪তম খণ্ড; হাকিম নিশাবুরি, মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল; তারিখু আহলিল বাইত ওয়া মাজমুয়ায়ে নাফিসাহ; ইহকাকুল হাক্ক, ১৯তম খণ্ড; তাযকিরাতুল খাওয়াস, আল ফুসুলুল মুহিম্মাহ।)

২. সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭০, হাদীস নং ৩৫৩৯; দারু ইবনে কাসীর প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈরুত, ১৯৮৭; সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৮৩, হাদীস ২৪২২, দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবি প্রকাশনী, বৈরুত;

৩. মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান বিন আহমাদ আবু হাতেম (মৃ. ৩৫৪ হি.), সহীহ ইবনে হিব্বান বি তারতিবি ইবনে বুলবান, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৪৩৪, মুয়াসসাতুর রিসালাহ প্রকাশনী, দ্বিতীয় মূদ্রণ, বৈরুত, ১৯৯৩,

৪. হাকেম নিশাবুরী, আল মুস্তাদরাক আলা সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১, হাদীস ৪৭১৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা প্রকাশনী, বৈরুত, প্রথম মূদ্রণ, ১৯৯০,

৫. যাহাবী শাফেয়ী, শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ওসমান (মৃ. ৭৮৪ হি.), সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩, মুয়াসসাতুর রিসালাহ প্রকাশনী, নবম মূদ্রণ, বৈরুত, ১৯৯৩,

৬. ইবনে সা'দ, তরজমাতুল ইমাম হাসান (আ.) পৃ. ৭৮;

৭. মানাকিব-এ আলে আবি তালিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯;

৮. মুখতাসারু তারিখে দামেশক, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৪;

৯. বাকের শারীফ কুরাইশী, আল হায়াতুল ইমাম আল হাসান বিন আলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩;

১০. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫;

১১. মানাকিব-এ আলে আবি তালিব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪;

১২. ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১৩;

১৩. সূরা মায়েদাহ : ৩২;

১৪. আল খারায়িজ ওয়াল জারায়িহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৬, হাদীস ৪;

১৫. হাসান মা'রুফ আল হাসানী, আল আয়িম্মাতুল ইসনা আশার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪২

১৬. ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭; আল-গাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০১

১৭. আল ইসাবাহ ফি তামাযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২

১৮. অর্থাৎ তাঁরা ক্ষমতাসীন থাকুন, আর ক্ষমতার বাইরে থাকুন।

১৯. সূরা শুরা, আয়াত নং : ২৩

২০. সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৩

২১. মুরুজুয যাহাব

২২. সূরা আহযাব, আয়াত নং ৩৩

২৩. মাদীনাতুল আল মাআজিয, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০, হাদীস ৮৬২; ইসবাতুল হুদাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩, হাদীস ৩৩২

যুগের ইমাম সংক্রান্ত হাদীসের ওপর একটি পর্যালোচনা

মোহাম্মাদ মুনীর হোসেইন খান

বেশ কিছু হাদীস আছে যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ নিজ যুগের ইমামকে না চিনে অথবা যে ইমামের বাইয়াত তার ওপর ফরয তাঁর বাইয়াত (আনুগত্য) না করে মারা যায়, তবে তার মৃত্যু জাহেলিয়াত অর্থাৎ কুফ্‌র ও শির্‌কের ওপর হবে। অর্থাৎ সে কাফির বা মুশরিক হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত ও হাদীস বিভিন্ন সনদসূত্রে এবং বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা তাফ্‌তাযানী 'শারহুল মাকাসিদ' গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

'তোমরা মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূল (সা.) ও তোমাদের মধ্য হতে উলীল আমরের (কর্তৃত্বশীল নেতৃবর্গের)'– এর ব্যাখ্যায় মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন :

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করবে।' তিনি এ হাদীসকে সুনিশ্চিত ও তর্কাতীত বলেছেন এবং এ হাদীসের ভিত্তিতে উক্ত গ্রন্থে স্বীয় আলোচনার অবতারণা করেছেন।[১]

আমীরে মুয়াবিয়া মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات بغير امام مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি ইমামবিহীন (ইমামের আনুগত্য না করে) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করবে।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات و ليس علي امام فميتته جاهلية

'যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্যের ওপর মৃত্যুবরণ করবে না, তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'[৩]

তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন :

من مات مفارقا للجماعة فقد مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি জামায়াত অর্থাৎ আপামর উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করবে আসলে সে জাহেলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করবে।'[৪]

হযরত ইবনে উমর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে আরও বর্ণনা করেছেন :

من مات بغير امام الجماعة مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি জামায়াত অর্থাৎ আপামর উম্মাহ্র ইমামের আনুগত্য ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।'[৫]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এভাবে :

من مات و ليس عليه امام جماعة فانّ موته موتة جاهلية

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার ওপর জামায়াত অর্থাৎ উম্মাহ্র ইমাম কর্তৃত্বশীল থাকবেন না তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'[৬]

মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে :

من مات و ليس عليه امام مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার ওপর ইমাম (কর্তৃত্বশীল) থাকবেন না সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।'[৭]

হযরত আমের ইবনে রাবীয়াহ মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات و ليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি মৃতুবরণ করে এমতাবস্থায় যে, তার ওপর (ইমামের) আনুগত্য নেই (ইমামের আনুগত্য করেনি) সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুই বরণ করবে।'[৮]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার গর্দানে বাইয়াত নেই সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।'[৯]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات بغير امام مات ميتة جاهلية و من نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له

'যে ব্যক্তি ইমাম ব্যতীত (ইমামের আনুগত্য না করে) মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে সে কিয়ামত দিবসে এমনভাবে পুনরুত্থিত হবে যে, তার (নাজাতপ্রাপ্তির পক্ষে) কোন প্রমাণ (হুজ্জাত) থাকবে না।'[১০]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من مات و هو مفارق للجماعة فانه يموت ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে নিশ্চয়ই জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।'[১১]

হযরত আবু হুরায়রা মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি (ইমামের) আনুগত্য থেকে বের হয়ে আসবে এবং জামায়াত থেকে পৃথক হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।'[১২]

হযরত আরফাজাহ মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

انه ستكون هنات و هنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة و هي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

'অচিরেই বহু বিপদাপদের উদ্ভব হবে; তাই যে ব্যক্তি এ উম্মাহ্র ঐক্য বিনষ্ট করবে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা কর সে যে-ই হোক না কেন।'[১৩]

হযরত ফুযালাহ ইবনে উবাইদ মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন :

ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة و عصي إمامه فمات عاصيا و امة أو عبد أبق من سيده فمات وامرأة غاب عنها زوجها و قد كفا ها و مونة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم

'তিন ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন কর না : ঐ ব্যক্তি যে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও সম্পর্কচ্ছেদ করেছে এবং নিজ ইমামের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, অতঃপর বিরুদ্ধাচারী রূপেই মৃত্যুবরণ করেছে; ঐ দাসী বা দাস যে স্বীয় মালিকের অবাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এবং ঐ নারী যার স্বামী তার থেকে অনুপস্থিত (গায়েব) রয়েছে এবং তাকে জীবনযাপনের পর্যাপ্ত রসদ ও সম্পদও দিয়ে গেছে, অতঃপর সে (অন্য পুরুষের সামনে) স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন (প্রকাশ) করেছে; এদের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কর না।'

আল হাকিম আন নিশাবুরী বলেন : 'এ হাদীসটি শায়খাইনের (বুখারী ও মুসলিমের) শর্তানুযায়ী সহীহ। কারণ, তাঁরা দুজন এ হাদীসটির সকল রাবীর (বর্ণনাকারী) মাধ্যমে ইহতিজাজ (দলিল বা যুক্তি প্রমাণ পেশ) করেছেন, তবে এ হাদীসটি তাঁরা নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেননি; আর আমিও (হাকিম) এ হাদিসের ইল্লাৎ (হাদীসের সনদ ও মতনের ঐ দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা যা বাহ্যত পরিদৃষ্ট হয় না এবং তা হাদীসশাস্ত্রবিদরাই কেবল শনাক্ত করতে সক্ষম) সম্পর্কে অবগত নই। আর আল্লামা যাহাবীও হাকিমের সাথে একমত যে, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী

বর্ণিত। আর তিনি (যাহাবী) বলেছেন : 'আমি হাদীসটির ইল্লাৎ সম্পর্কে অবগত নই।'[১৪]

অতএব, উপরোল্লিখিত এসব হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতি যুগে অবশ্যই ইমাম বিদ্যমান থাকবেন যাঁকে চেনা, বিশ্বাস করা এবং আনুগত্য করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র ওপর ফরয; আর তাঁকে না চিনে ও আনুগত্য না করে যে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যুই হবে জাহেলিয়াত অর্থাৎ শির্‌ক ও কুফ্‌রের ওপর।

এ হাদীসের সনদ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা

'যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু'– এ হাদীসটি বেশ কিছু সংখ্যক সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবীর নিকট থেকে বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাই এসব রেওয়ায়েতের সনদ সূত্র এবং এগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে বিতর্ক ও বিরূপ মন্তব্য করার সাহস কারও নেই। কারণ, এসব রেওয়ায়েত সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, মুসনাদ, সুনান ও মুজামসহ সকল ধরনের হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকল মাযহাব ও ফির্কার কাছে এ রেওয়ায়েত বা হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এ হাদিসের সত্যতার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌ ঐকমত্য পোষণ করেছে।

এ হাদীস বিভিন্ন বাচনভঙ্গি ও শব্দসহ বর্ণিত হলেও এসব কিছুই একটি অর্থের দিকেই প্রত্যাগমন করে, যা হচ্ছে প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য একজন হাদী (সুপথ প্রদর্শনকারী) ইমামের বিদ্যমান থাকার আবশ্যকতা যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা উম্মাতের ওপর ফরয। আর মহানবী (সা.) এ হাদীসের দ্বারা এ কাঙ্ক্ষিত অর্থটি বুঝিয়েছেন।

বিশিষ্ট মুফাস্‌সির ফখরুদ্দীন আল রাযী প্রণীত আল মাসায়েল আল খামসুন গ্রন্থে হাদীসটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

من مات و لم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا

'যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে, সে যদি চায় তাহলে ইয়াহুদী হয়ে অথবা (যদি চায়) খ্রিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক।'[১৫]

তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এ হাদীসটি যে মুতাওয়াতির (অকাট্যসূত্রে বর্ণিত) তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

আল্লামা আল আলবানী তাঁর 'সিলসিলাতুল আহাদীস আয যাঈফাহ' গ্রন্থে 'যে ব্যক্তি তার নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে বা তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু'– এ হাদীসকে অস্বীকার করেছেন অর্থাৎ মাওযু (বানোয়াট) বলেছেন। অথচ এ হাদীসের ব্যাপরে তাঁর এ অভিমত আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ আলেম ও হাদীসবেত্তাদের অভিমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ, আমরা ইতোমধ্যে আল্লামা তাফতাযানীর মত আলেমদের অভিমত এক্ষেত্রে তুলে ধরেছি। আর এ হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্য পোষণ আল্লামা আলবানীর এ হাদীস সংক্রান্ত অভিমত খণ্ডন ও তার অসারতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তাই একক ব্যক্তি হিসেবে আল্লামা আলবানীর অভিমত হাদীসটির সত্যতা ও তাওয়াতুরের (অকাট্য বর্ণনার) মোটেও ক্ষতিসাধন করে না।

উপসংহার

যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে... – এ হাদীসের আলোকে ইমাম সংক্রান্ত জ্ঞান ও পরিচিতি অর্জন করা হচ্ছে ইমামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ভূমিকা বা পূর্বশর্ত স্বরূপ। তাই উক্ত হাদীস আসলে যে ব্যক্তি নিজ যুগের ইমামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের ওপর– এ বিষয়ের প্রতি দিকনির্দেশ করে। এ হাদীসে বর্ণিত নিজ যুগের ইমাম বলতে আবশ্যকভাবে সত্য ইমাম, অত্যাচারী বাতিল ইমাম নির্বিশেষে যে কোন ইমামকে বোঝানো হয়নি, বরং এখানে ইমামের কাঙ্ক্ষিত অর্থ হবে নিজ যুগের সত্য ইমাম– নিজ যুগের বৈধ অর্থাৎ শরীয়ত স্বীকৃত ইমাম বা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত যুগের ইমাম।

তাই যে ব্যক্তি তার নিজ যুগের সত্য, শরীয়ত স্বীকৃত ও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করবে সে আসলে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে। আর তা না হলে যদি যুগের ইমাম বলতে মুসলমানদের ওপর কর্তৃত্বশীল যে কোন শাসককে (যেমন মুয়াবিয়া, ইয়াযীদ, মারওয়ান, তৈমুর লং এবং সমসাময়িক কালের শাসকবর্গ, যেমন জর্দানের বাদশাহ হোসেন, মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল

আবদুন নাসের বা আনোয়ার সাদাত, মরক্কোর বাদশাহ হাসান, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন, নব্য তুর্কী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কামাল আতা তুর্ক, ইন্দোনেশিয়ার স্বৈরশাসক জেনারেল সুহার্তো প্রমুখকে) বোঝায় তাহলে এ ধরনের শাসকবর্গ সংক্রান্ত জ্ঞান ও পরিচিতি অর্জন এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য অবশ্যই ফরয হবে না। আর এ ধরনের শাসকবর্গকে না চিনে এবং বিশ্বাস ও আনুগত্য না করে মৃত্যুবরণ করলে তা যেমন জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে না; তেমনি তা পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণও হবে না।

সুতরাং যে ইমামের জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ করা ফরয তিনি অবশ্যই হবেন সত্য ইমাম। আর তখনই প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয হবে এ ইমামের ইমামতে বিশ্বাস স্থাপন এবং তার নিজের ও স্রষ্টার মাঝে তাঁকে (ইমাম) হুজ্জাত (হেদায়াত ও নাজাত প্রাপ্তির দলীল) হিসেবে গণ্য করা; আর যদি সে এ ধরনের ইমামের ইমামতে বিশ্বাস স্থাপন না করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের ওপর। অর্থাৎ যদি চায় তো সে ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান হয়েই মৃত্যুবরণ করুক। আর এর অর্থ হচ্ছে, সত্য, বৈধ ও মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত ইমামের ইমামতে বিশ্বাসী না হয়ে এবং তাঁর আনুগত্য না করে মৃত্যুবরণ করলে পরিপূর্ণ মুসলিম ও মুমিন হয়ে মৃত্যুবরণ করা যাবে না। আর মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র কুরআন পূর্ণ মুত্তাকী এবং সত্যিকার মুসলিম-মুমিন হয়ে মৃত্যুবরণ করার নির্দেশ[১৬]দেওয়াসহ মহান আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং উলিল আমর অর্থাৎ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারীদের (ইমামদের) নিরঙ্কুশ আনুগত্য[১৭] এবং কুফরী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম[১৮] এবং তাগুত বর্জন ও পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে।[১৯]

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর যিনি হযরত আলী (আ.)-এর বাইয়াত করেননি, অথচ তিনি উমাইয়্যা বংশীয় খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার জন্য রাতের বেলা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বাসভবনে যান যাতে ঐ রাতটিও যেন তিনি ইমামবিহীন না কাটান। আর তাঁর এটা করার উদ্দেশ্যই ছিল এ হাদীসের ভিত্তিতে, যেমনটি তিনি নিজেও বলেছেন। ইবনে উমর, হাজ্জাজের কাছে গিয়ে তার কাছে খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের উদ্দেশ্যে বাইয়াত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন : আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি : من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার কোন ইমাম নেই সে জাহেলিয়াতের

মৃত্যুবরণ করবে।' কিন্তু হাজ্জাজ, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে হেয় ও অবজ্ঞা করে পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল : 'আমার পা ধরে বাইয়াত কর।' আর ইবনে উমরও হাজ্জাজের পা ধরে বাইয়াত করেছিলেন!

আর এটাই স্বাভাবিক যে, যে ব্যক্তি হযরত আলী (আ.)-এর মত ব্যক্তির বাইয়াত করা থেকে বিরত থাকে, পরিণামে একদিন তাকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মত জালেম শাসকের কাছেই এভাবে বাইয়াত করতে হবে।

হাররার ঘটনা বা মদীনার ঐতিহাসিক হাররার যুদ্ধে পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ তিন দিনের জন্য পবিত্র মদীনা নগরীকে তার সেনাবাহিনীর জন্য হালাল অর্থাৎ যা ইচ্ছা তার করার অনুমতি দিয়েছিল। এ অনুমতি পেয়ে ইয়াযীদের সেনাবাহিনী পবিত্র নগরীতে ব্যাপক গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। দশ হাজারের অধিক সাধারণ মুসলমানকে তারা হত্যা করেছিল। শত শত সাহাবী ও তাবেয়ী ইয়াযীদী বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অসংখ্য কুমারী মেয়ের সতীত্ব হানি করেছিল এই হানাদার বাহিনী এবং এ ঘটনার পর মদীনার অগণিত মহিলা শত শত জারজ সন্তানও জন্মদান করেছিল। আর এ ঘটনা ঘটেছিল কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ.)-এর হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঠিক এক বছর পর।

এ হাররার যুদ্ধের সময় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতীর কাছে গমন করলে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুতী বললেন : 'আবু আবদির রহমানের (আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর) বসার জন্য একটি তাকিয়া (গদি বা বালিশ) নিয়ে এস।' কিন্তু তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর তাঁকে বললেন, 'আমি তোমার কাছে বসার জন্য আসিনি। আমি তোমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করার জন্য এসেছি। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি :

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি (ইমামের) আনুগত্য হাত গুটিয়ে নেবে সে (কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ্কে সাক্ষাৎ করবে এমতাবস্থায় যে, তার কোন হুজ্জাৎ (নাজাতপ্রাপ্তির দলিল বা উপায়) বিদ্যমান থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এমতাবস্থায় যে, তার

গর্দানে কোন বাইয়াত নেই (অর্থাৎ সে ইমামের বাইয়াত ও আনুগত্য করেনি) সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।' (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ)

তাই প্রতি যুগের ইমামকে চেনা, তাঁর ইমামতে বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর বাইয়াত ও আনুগত্যের ওপর অটল থাকা যে ফরয তা একান্ত সুনিশ্চিত ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আর অজস্র হাদীস এবং সাহাবী ও মুসলিম উম্মাহর সীরাত ও অনুসৃত নীতির দ্বারাও এ বিষয়টি সত্য প্রমাণিত হয়। আমরা এখানে উদাহরণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরের প্রসঙ্গই শুধু উল্লেখ করলাম যিনি হচ্ছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আলী (আ.)-এর বাইয়াত এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী মুয়াবিয়ার নেতৃত্বাধীন সিরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য আফসোস করতেন। অধিক অবগতির জন্য তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৫-১৮৬; আল হাকিম আন নিশাবুরী প্রণীত আল মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৮ ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বা অন্য কারও ব্যাপারে আলোচনা করা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। প্রতিটি যুগে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সত্য ইমাম অবশ্যই থাকবেন, তাঁর ইমামতে বিশ্বাস এবং তাঁকে মহান আল্লাহ্ ও উম্মাহ্র মাঝে হুজ্জাত বলে গণ্য করা মুসলমানদের ওপর ফরয। এ বিষয়টি যে জরুরি ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের সীরাত থেকে কেবল নমুনা পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

এ হাদীসের পাশাপাশি হযরত আলী (আ.)-এর নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ বাণী সবিশেষে প্রণিধানযোগ্য যার ওপর মুসলিম উম্মাহ্র ঐকমত্য রয়েছে :

إنّ الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة:

'বিশ্বজগৎ মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুজ্জাত (ঐশী দলিল-প্রমাণ সহকারে দণ্ডায়মান ব্যক্তি অর্থাৎ ইমাম) বিহীন থাকতে পারে না।'

হযরত আলী (আ.) বলেছেন :

اللهم بلي، لا تخلو الارض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا و إما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله بيناته

'হে আল্লাহ্! হ্যাঁ, অবশ্যই নিখিল বিশ্ব মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুজ্জাত (ঐশী দলীল-প্রমাণ) সহকারে দণ্ডায়মান ব্যক্তি (কায়েম অর্থাৎ ইমাম) বিহীন থাকতে পারে না। হতে পারে তিনি (ইমাম) প্রকাশ্যে বিদ্যমান ও মশহুর (অর্থাৎ সবার কাছে পরিচিতি ও প্রসিদ্ধ), নতুবা ভীত ও গোপন অর্থাৎ লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন যাতে মহান আল্লাহ্র সুস্পষ্ট ঐশী প্রমাণাদি বাতিল প্রতিপন্ন না হয়।'

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন : 'শেষ যুগে অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খুব কাছাকাছি সময়ে এ উম্মাহ্র এক ব্যক্তির (ইমাম মাহদী) পেছনে হযরত ঈসা (আ.)-এর নামায আদায় করার মধ্যে 'সৃষ্টিজগৎ মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে হুজ্জাত (ঐশী দলীল প্রমাণ) সহকারে দণ্ডায়মান (কায়েম) ব্যক্তি (অর্থাৎ ইমাম) বিহীন থাকতে পারে না' – এ সত্য কথার প্রমাণ মেলে।[২০]

ইবনে আবীল হাদীদ হযরত আলীর উক্ত বাণী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : 'যাতে কোন যুগই মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভয়ভীতি থেকে বান্দাদের নিরাপত্তা দানকারী ও তাদের ওপর কর্তৃত্বশীলবিহীন থাকতে পারে না। তবে আমাদেরআলেম এই 'কায়েম লিল্লাহি বি হুজ্জাহ'-কে আবদাল[২১] অর্থে গ্রহণ করেছেন।'

অথচ ইবনে আবীল হাদীদের সহযোগীরা সম্ভবত হুজ্জাত শব্দের অর্থের ব্যাপারে উদাসীন ও অসচেতন থেকেই গেছেন। কারণ, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুজ্জাত সহকারে দণ্ডায়মান যিনি, তিনি অবশ্যই মাসূম (নিষ্পাপ) হবেন। আর কোন ব্যক্তিই আবদালদের মাসূম বলেনি।

আর ইবনে আবীল হাদীদ ও তাঁর সহযোগীরা 'যাতে মহান আল্লাহ্র ঐশী ও সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণাদি বাতিল হয়ে না যায়' – এ বাক্যের অর্থের ব্যাপারেও উদাসীন ও অসচেতন থেকে গেছেন। কারণ, মহানবী (সা.)-এর পরে একমাত্র নিষ্পাপ ইমাম ব্যতীত তা বাস্তবায়িত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই ইবনে আবীল হাদীদ প্রথমে যে স্বীকারোক্তি করেছেন সেটাই সত্য।

তথ্যসূত্র :

১. শারহুল মাকাসিদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯

২. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৬; হুলইয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৪ (এ হাদীসটি যে সহীহ তা এখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে); আল মুজামুল কাবীর, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ (দারুল ফিকর কর্তৃক প্রকাশিত), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৩ এবং ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫ ।

৩. ইতহাফ সাদাতিল মুত্তাকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০ ও ২৩১ ।

৪. আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব আল বাগদাদী প্রণীত, প্রকাশক : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, বৈরুত, লেবানন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫; মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০, ৯৩, ৯৭, ১২৩; আল মুজামুল কাবীর (ইরানে মুদ্রিত), ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৫; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৬৫, হাদীস নং ১৪৮৬২; আত তারীখুল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫ ।

৫. আল মুজামুল কাবীর, প্রকাশক : দার ইহয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭; ইতহাফ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪ ।

৬. মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, আল হাকিম আন নিশাবুরী প্রণীত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯, হাদীস নং ৪০৭, প্রকাশক : দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, ১৪২২ হি. (আল্লামা যাহাবী তাঁর আত তালখীস গ্রন্থে এ হাদীসটি সনদ ও মতন সহকারে উল্লেখ করেছেন; তবে তিনি সহীহ অথবা দুর্বল হবার ব্যাপারে কোনরূপ মন্তব্য করা থেকে নীরব থেকেছেন), ইতহাফ সাদাতিল মুত্তাকীন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১২২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, (কুদ্‌সী প্রকাশিত), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৫; আদ দুররুল মানসূর, প্রকাশক : ইসলামিয়া প্রকাশনী, তেহরান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১ ।

৭. ইবনে আবী আসেম প্রণীত আস সুন্নাহ, প্রকাশক : আল মাকতাব আল ইসলামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫ ।

৮. মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৩ ।

৯. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৮১৪, পৃ. ৭১৮, প্রকাশক : দার সাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৭, প্রকাশক : দার কুতাইবাহ, দামেশক, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৪১০ হিজরি (১৯৯০ খ্রি.) সিলসিলাতুল আহাদীস আস সাহীহাহ (আল্লামা আল

আলবানী প্রণীত), আল মাকতাবুল ইসলামী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১৫; আত্ তাজুল জামে লিল উসূল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

১০. মুসনাদে আবি দাউদ, দারুল মারেফাহ, পৃ. ২৫৯।

১১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩ ও ১৫৪।

১২. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৮০৯, পৃ. ৭১৮, প্রকাশক : দারু সাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৪২৫ হিজরি (২০০৪ খ্রি.)।

১৩. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ৪৮১৭, পৃ. ৭১৯, প্রকাশক : দার সাদির, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৪২৫ হিজরি (২০০৪ খ্রি.)।

১৪. আল হাকিম আন নিশাবুরী, আল মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১, হাদীস নং ৪১৫, প্রকাশক : দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৪২২ হিজরি।

১৫. আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ আলী আল হুসাইনী আল মীলানী, আল ইমাম আল মাহদী, পৃ. ২৩; প্রকাশক : ওয়াফা, কোম, ইরান, প্রথম সংস্করণ, প্রকাশকাল : ১৪৩১ হি.।

১৬. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلاّ و أنتم مسلمون

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমন ভয় কর এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।' (সূরা আলে ইমরান : ১০২) (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত ঈমানের মূল সারবত্তা তোমরা অবশ্যই রক্ষা করবে।)

১৭. তোমরা আনুগত্য কর মহান আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য হতে উলুল আমরের (কর্তৃত্বশীল নেতৃবর্গের)। (সূরা নিসা : ৫৯) (লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এ আয়াতে যেমন নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশভাবে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি উলুল আমরের আনুগত্যও। আর এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা মুসলমানদের উলুল আমর হবেন তাঁরা নিষ্পাপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হবেন কিন্তু তাঁরা নবী হবেন না; কারণ, মহানবী (সা.)-এর পরে নতুন কোন নবীর আগমন হবে না এবং নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। তাই এসব উলুল আমর হচ্ছেন মহানবী (সা.)-এর ওয়াসী।

১৮. فقاتلوا أئمة الكفر 'অতঃপর তোমরা কুফরের নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুদ্ধ (জিহাদ) কর'... (সূরা তওবা : ১২)

১৯. و لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এতদুদ্দেশ্যে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।' (সূরা নাহল : ৩৬)।

২০. ফাতহুল বারী ফী শারহি সাহীহিল বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; এ হাদীসটি আহলুস সুন্নাতের অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন : আল্লামা ফখরুদ্দীন আল রাযী প্রণীত আত তাফসীর আল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২; শারহুল মাকাসিদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৫; তারীখে বাগদাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; আল ইকদুল ফারীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; আবু কুতাইবা প্রণীত উয়ুনুল আখবার, পৃ. ৭ প্রভৃতিতে বর্ণিত হয়েছে।

তদ্রূপ ইমামিয়াদের বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ, যেমন : আল কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬ এবং কামালুদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭ তেও এ হাদীসটির উল্লেখ আছে।

২১. শারহু নাহজিল বালাগাহ, হিকমাত ১৪৭, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ৩৫১।

(এ প্রবন্ধ আয়াতুল্লাহ্ সাইয়্যেদ আলী হুসাইনী মীলানী প্রণীত ইমাম আল মাহদী (আ.) গ্রন্থের 'যে ব্যক্তি তার নিজ যুগের ইমামকে না চিনে মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যু– এ হাদীস সংক্রান্ত আলোচনা অবলম্বনে অনূদিত, রচিত, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত।)

আপনার জিজ্ঞাসা

[জানার কৌতূহল মানুষের সহজাত। শিশুমুখে প্রথম বুলি ফোটার সাথে সাথে হাজারও প্রশ্নের অবতারণা করার মাধ্যমে সে সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। আর জীবনের শেষ স্পন্দন অবধি চলে মানুষের এ কৌতূহলের ক্ষুধা। তাই জিজ্ঞাসার শেষ নেই। যদিও একেক সমাজ ও শ্রেণীর কাছে এ জিজ্ঞাসাগুলো একেক রকম হয়ে থাকে, কিন্তু আধুনিক যুগে এসে গোটা মানব জাতি এমন কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে যেগুলো জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চোখ ধাঁধানো বিকাশের প্রভাবে বস্তুগত বিত্ত-বৈভবে বুঁদ হয়ে পড়া আধুনিক মানব জাতির যেন একটি জিনিসই তার নিজের পাওনা হয়েছে। আর সেটি হল মানুষের 'আত্মপরিচয়' হারিয়ে ফেলা। ফলে আর কিছুতেই তার হিসাব মেলে না। যে মানুষ একসময় ঐশী বাণীর সুধা মেখে রাতে বিছানায় যেত, আর দিন শুরু করত পরম তৃপ্তি নিয়ে, এমনকি ধর্মের পরম প্রণালীর উষ্ণ ছোঁয়ায় মৃত্যুকেও বরণ করে নিত প্রশান্তিময় আলিঙ্গনে; অথচ কী হয়েছে, কেন এখন মানুষের জন্য বেঁচেও শান্তি নেই, মরেও শান্তি নেই। ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যারা স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছিল তারাও আজ স্থবিরতায় মূক হয়ে পড়েছে। আর এ কৃত্রিম দোটানার মধ্যে পড়ে যারা সবচেয়ে বেশি দিশাহারা অবস্থায় পতিত হয়েছে, তারা আমাদেরই শিক্ষিত ও যুব সমাজ। কত প্রশ্ন তাদের মনে। তবে কি দীন-ধর্ম থেকে পিছিয়ে এলেই সব পাওয়া হবে? ধর্মীয় অনুশাসনই কি আমাদের উন্নতির অন্তরায়? যদি তা-ই হয়, তাহলে কেন আমাদের আগে যেসব জাতি এ পথে হেঁটেছিল তাদের মধ্যে আবার ধর্মের পথে ফিরে আসার আকুতি? কেন তবে প্রতিদিন পত্রিকা খুললে চোখে পড়ে অসংখ্য মানুষের ইসলাম গ্রহণের ও তাদের ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার অঙ্গীকার ঘোষণার খবর! আমাদের যুবা ও শিক্ষিতদেরও কি তাহলে এ পথের মাথা পর্যন্ত গিয়ে ব্যর্থতার খবরটা নিয়ে আসতে হবে এবং তবেই বিশ্বাস হবে যে, সত্য ঐ একটিই যা সত্যধর্মে বর্ণিত হয়েছে, আর সবই অন্তঃসারশূন্য। নাকি যতটুকু হেঁটে এসেছে সেখানে দাঁড়িয়েই বিজ্ঞানের মোড়কে চরম বস্তুবাদের তিক্ত স্বাদ নিয়ে যারা ফিরে আসতে শুরু করেছে তাদের অভিজ্ঞতাকেই যথেষ্ট বলে গ্রহণ করে নিতে পারে। যদি কথা এটিই হয় তাহলে সময় নষ্ট না করে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলো কেন্দ্রীভূত করি সত্যধর্মকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে, গড়ে তুলি ঐশী ছায়াতলে এক ছন্দময় আদর্শের জীবন। এ প্রত্যাশাকে সামনে রেখেই এখন থেকে আমাদের এ সাময়িকীতে সংযোজিত হল

'আপনার জিজ্ঞাসা' নামের নতুন এ সংযোজন। সচেতন পাঠকবৃন্দ তাঁদের চিন্তাপ্রসূত জিজ্ঞাসাকে প্রশ্নাকারে লিখতে পারবেন প্রত্যাশার ঠিকানায়। গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োচিত জিজ্ঞাসাগুলোর বিশ্লেষণধর্মী জবাব নিয়ে হাজির হবে 'প্রত্যাশা' তার প্রতিটি সংখ্যায়।]

এবারের প্রশ্ন পাঠিয়েছেন মোঃ মনিরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম থেকে।

প্রশ্ন : জীবন পরিবর্তনশীল। নতুন যুগের চাহিদাও নতুন। কিন্তু ইসলাম শাশ্বত, চিরন্তন। তাহলে ইসলামের পুরানো আইন ও বিধান কীভাবে মানুষের চিরকালের সমস্যাবলির সমাধান প্রদান করতে সক্ষম হবে? এক কথায় আধুনিক জীবনে ইসলামের কোন ভূমিকা রাখার অবকাশ আছে কি?

উত্তর : ধন্যবাদ। এ প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে এ যুগের আলোচ্য বিষয়গুলোর অন্যতম। এর উত্তরও দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। তবে সঠিক উত্তর জানা অনেকটা নির্ভর করে ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক পরিচয় থাকার ওপর। যদিও এ পরিচয় অর্জন করার জন্য অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ফলে খুব সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর আশা করার অবকাশ নেই।

যুগের আধুনিকতা এবং সে সূত্রে পরিবর্তিত চাহিদাসমূহ পূরণে পুরানো ধর্মীয় বিধি-বিধানের সামর্থ্য কতটুকু– এ প্রশ্নে আমরা নিজেদের দু'টি জিনিসের সম্মুখীন দেখতে পাই। একদিকে ইসলামী বিধি-বিধান, আরেকদিকে আধুনিকতা, যা একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। সময়ের চাকা ঘুরবেই, সে সাথে পরিবর্তিত হবে জীবনের ধরন-মান। উন্নত থেকে উন্নততর হবে, ঘটবে বিবর্তন ও প্রসার। এমন নয় যে, এ সমস্যা শুধু আধুনিক কালে এসেই উদ্ভূত হয়েছে; বরং পরিবর্তন, বিবর্তন ও প্রসার হল মানব জীবনের অনিবার্য সঙ্গী। এ পৃথিবীতে মানব পা রাখার দিন থেকেই এ পরিবর্তনের ধারাও শুরু হয়ে যায়। সে ধারায় অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করেই মানব জীবন আজ এ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তবে এটি ঠিক যে, আধুনিক কালে এ ধারার লেখচিত্র অনেকটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। যেন এক বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। যার নজির আগে কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হয় এখান থেকে যে, আধুনিকতার এ বিশাল জৌলুসের নজরকাড়া পরিবর্তনের পাদমূলে দাঁড়িয়ে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসাবে আমার করণীয় কী? আমি কি আমার ধার্মিকতা বজায় রেখে এ আধুনিকতাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাব, নাকি অবস্থা এমন বেগতিক যে, যদি একটি বজায় রাখতে চাই তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে আরেকটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়?

সমাজে সচরাচর তিন শ্রেণীর মানুষ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীটি হল তারা, যারা আমাদের মত মুসলিমপ্রধান দেশে মূলত ইসলামের পক্ষেই অবস্থান নিয়ে ধর্মকেই আঁকড়ে ধরে। তারা মনে করে, ইসলাম পালন ও ধার্মিক হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজন হল আধুনিকতা ও নতুনত্বকে ঘৃণা করা। যা কিছু নতুন, সেটাই ধর্মের পরিপন্থী বলে মনে করতে হবে। এভাবে তারা ক্রমে পেছনের দিকে হাঁটে। মোটকথা, তারা ধর্মের নামে সভ্যতা ও জীবনের আধুনিকতা ও উন্নতি থেকে পশ্চাদমুখী হয়ে চলে।

এর ঠিক বিপরীতে রয়েছে আরেকটি শ্রেণী, যারা আধুনিকতা, বিজ্ঞান ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ধুয়ো তুলে নিজেদের ধর্ম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নেয়। ধর্ম তাদের দৃষ্টিতে সেকেলে ব্যাপার। 'প্রাচীন' শব্দটি তাদের দৃষ্টিতে জীর্ণতার সমার্থক। এদের কাছে পুরাতন মানেই অসার, অকেজো, জীর্ণ ও ফেলনার বিষয়। ঠিক এ কারণেই সমাজে আরেকটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে– ভারসাম্যপূর্ণ। সুখের বিষয় হল, সমাজে কমবেশি এ শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। এখানে আমাদের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় বাস্তব অবস্থাটা কী? আসলেই কি মুসলমান ও ধার্মিক থাকা এবং একই সাথে আধুনিক ও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলাও সম্ভবপর নাকি তা সম্ভব নয়?

এ বিষয়টি অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে ইসলামের ক্ষেত্রে বেশি তীব্র। কারণ, ইসলামই হল সে ধর্ম, যা একদিকে যেমন ঘোষণা করেছে যে, আর কোন নবী আসবেন না, আর না আসবে কোন শরীয়ত; অপরদিকে সে চিরন্তন ধর্মেরও দাবিদার। অর্থাৎ এ ধর্মে যে আইন ও বিধান ঘোষণা করা হয়েছে তা চিরকালীন, চিরন্তন। ইসলামের জন্য বিষয়টি আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এর পরিধি ও বিস্তৃতির কারণে। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলাম যদি গুটি কতক উপদেশ-বাণী ও নীতিকথার নাম হত তাহলে সমস্যা এতটা ব্যাপক হত না। কিন্তু যখন জীবন ও সমাজের এমন কোন অঙ্গন নেই যা ইসলামের আইন ও বিধানের আওতায় পড়ে না– ধর্মাচার, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিচার-আদালত, সমরনীতি, বৈদেশিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ইত্যাদি জীবনের সব অঙ্গনের জন্যই ইসলাম নিয়ে এসেছে স্পষ্ট বিধান। শুধু তা-ই নয়, এ বিধান শাশ্বত ও চিরন্তন, সব যুগের সকল জনপদের জন্য। কাজেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ইসলামের ওপর দায়ভারটা কতখানি!

এখন আমরা ইসলামের আইন ও বিধানের প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্য কিছু গভীর আলোচনায় প্রবেশ করব। সাথে সাথে সময়ের তালে জীবনে যে পরিবর্তন ও বিবর্তন সাধিত হয় তারও প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করব।

আগেই বলা হয়েছে এখানে আমরা দু'টি বিষয়ের সম্মুখীন। একটি হল যুগ ও ইতিহাসের পরিবর্তন, বিবর্তন ও উন্নয়ন ধারা, এক কথায় যাকে বলা হয় আধুনিকতা। মনুষ্য জীবনে যা অনস্বীকার্য, ছায়ার মত অনুসরণ করে চলে তাকে। আর দ্বিতীয়তটি হল চিরন্তন দীন হিসাবে ইসলামী বিধি-বিধানের শাশ্বত হওয়া।

কোন প্রাণীরই, এমনকি যারা সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে (যেমন মৌমাছি) তাদের জীবনও মানুষের জীবনের মত এত পরিবর্তনশীল নয়। আধুনিক গবেষণায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৌমাছি আজও যে ষড়ভূজাকৃতির বাসা বানিয়ে থাকে, হাজার বছর আগেও ঠিক সেভাবেই বানাত। কিন্তু মানুষের জীবনমান সময়ের পরিক্রমায় বদলে যায় দিনকে দিন। অন্যান্য জীবজন্তু প্রকৃতির স্বভাব তাড়িত হয়ে আদিকাল থেকে সেই একই ধারায় জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু মানুষ শুরুতে যে দুর্বল জীবনযাত্রার অধিকারী ছিল, ঐশী পুরুষগণের পথ-নির্দেশনা আর নিজস্ব প্রতিভা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক পথ পাড়ি দিয়েই আজকের এ আধুনিকতায় পা রেখেছে। মানব জীবনের এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় অনেক দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রুতিবহুল তত্ত্বটি হল : 'এ বিশ্বজগতের অমোঘ নিয়মই হল পরিবর্তনশীলতা।' এখানে কোন কিছুই নিশ্চল ও স্থির নয়। এক মুহূর্তের আগের অবস্থার সাথে পরের অবস্থার মিল নেই। দার্শনিকরা জগতের এ গতি, যা জগতের essence বা সারসত্তাগত, সে সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। এমনকি মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ (হাকিম) জগতের জন্য substantial motion তথা 'সারবস্তুগত গতি' তত্ত্বের প্রবক্তা হয়েছেন এবং প্রকৃতিকে গতি ও পরিবর্তনের নামান্তর বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি = গতি (পরিবর্তনশীলতা)। এ তত্ত্ব প্রয়োগ করে এ ব্যক্তিরা বলেন, যখন এ জগতের আসল ভিত্তিই গতি ও পরিবর্তনের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে এবং এখানকার কোন কিছুই শাশ্বত ও চিরন্তন নয়, অপরদিকে দীনও এ জগতেরই অন্তর্গত বিষয়, সুতরাং দীনও শাশ্বত ও চিরন্তন হতে পারে না। কারণ, এখানে সবকিছুই চিরন্তনতার বিরুদ্ধে।

তবে যদি ব্যাপারটি কেবল এরূপ এক রসকষহীন দার্শনিক যুক্তির ওপরে রেখে দেখা হয় তাহলে তার উত্তরও খুব সহজ। উত্তরটি হল : জগতে যা কিছু পরিবর্তনশীল সেগুলো হল এর বস্তুগত জিনিস। এগুলো যে পরিবর্তনশীল, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। স্বয়ং দীনের প্রবর্তনকারী যে নবী, তিনিও যেহেতু এ নিয়মের অধীন, এ কারণে তিনিও একটি ক্ষুদ্র নবজাতক হয়েই দুনিয়াতে আসেন। অতঃপর গতি ও পরিবর্তনের ধারায় শৈশব, কৈশোর ও যৌবন পার করে বার্ধক্যে পৌঁছেন। তারপর একসময় মৃত্যবরণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : 'নিশ্চয় তুমি মরণশীল, তারাও মরণশীল।'[১] কিন্তু এখানে বিষয়টি হচ্ছে জগতের নিয়ম-কানুন নিয়ে। জগতের নিয়ম-কানুনগুলোও কি তবে পরিবর্তনশীল? আমাদের এ সূর্যও একদিন নিস্প্রভ হয়ে যাবে সত্য। গ্রহ-নক্ষত্রও তদ্রূপ। বিশ্বের সকল জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সবই এ নিয়মের অধীন ঠিকই। কিন্তু এর মানে কি এটা যে, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের সূত্রগুলোও বদলে যাবে? ইসলাম হচ্ছে নিয়ম-কানুন, কোন (বস্তুগত) জিনিস নয়। আর যা বদলে যায় তা হল বস্তুগত জিনিস। তাই পবিত্র কুরআনও চিরন্তন থাকবে যদিও নবী মৃত্যুবরণ করেন। একদিকে আল্লাহ বলছেন, 'নিশ্চয় তুমি মরণশীল, তারাও মরণশীল', অপরদিকে কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কেও স্বয়ং আল্লাহই বলছেন : 'নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরাই তার রক্ষাকারী।'[২]

কুরআনের কাগজ-কালি ও মলাট জীর্ণ হয়ে যাবে ঠিকই। কিন্তু কুরআনের হাকীকত (সারসত্য ও অর্থ) রয়ে যাবে চিরন্তন। ইসলাম হল ভেতরের হাকীকত সদৃশ, বাইরের রূপকাঠামো নয়। কাজেই ইসলাম যেহেতু নিয়ম ও বিধানের এক সমষ্টি, সেহেতু আমাদের জানতে হবে সে নিয়ম ও বিধানসমূহ কতটা স্বভাবিক ও প্রাকৃতিক রূপে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ কতটুকু প্রকৃতির স্বভাব ও গড়নের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম হচ্ছে নিয়ম ও বিধানের বর্ণনাকারী। ইসলামের এ বিধি-বিধান আসলে কোন আরোপকৃত বা প্রণয়নকৃত বিষয় নয়; বরং তা হল একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধান, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ বিধানে মানবের সামাজিক প্রকৃতিকে বিচেনায় রাখা হয়েছে। এ বিধান মানব জীবনধারার মূল অক্ষকে নির্ধারণ করে দেয়।

এখানে আরেকটি বিষয় মানব জীবনের নিয়ম সম্পর্কে আরও কিছু গভীরতা নিয়ে সামনে আসতে পারে। তা হচ্ছে কেউ এ যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে যে, আমরা যে বলি 'ইসলাম চিরন্তন নয়'– সেটা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলি না যে, প্রকৃতির নিয়ম-কানুনগুলো পরিবর্তনশীল; বরং সেটা বলি এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মূল মানব জীবনের নিয়মই (মানব জীবন হওয়ার কারণেই তা) পরিবর্তনশীল। কেননা, যেহেতু মানুষ হচ্ছে এমন এক অস্তিত্ব, যে নিজেই নিজের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু মানবের জীবন বদলে যায় ও উন্নতি লাভ করে, সুতরাং মানুষের প্রয়োজনসমূহও বদলে যায়। আইন প্রবর্তিত হয় মানুষের প্রয়োজনসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে পূরণ করার জন্য। কারণ, আইনই মানুষের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করার সম্মানজনক ও ন্যায়নিষ্ঠ উপায় বাৎলে দেয়। কাজেই আইন ও বিধানের মূল প্রোথিত সামাজিক প্রয়োজনসমূহের মধ্যে। সুতরাং মানুষের প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতিগুলোও পরিবর্তনশীল।

প্রস্তর ও গুহার যুগের মানুষের প্রয়োজনগুলো ছিল এক ধরনের। আবার কৃষি যুগের প্রয়োজনগুলো অন্য ধরনের। আর আজ আমাদের এ আধুনিক শিল্প যুগে মানুষের প্রয়োজনগুলো শিল্প ও যন্ত্রের প্রভাব অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। তাই প্রয়োজনগুলো যখন পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তখন আইন ও বিধানগুলোও স্বভাবিকভাবেই বদলে যাবার কথা।

এ বক্তেব্যের যারা প্রবক্তা, তাদের দৃষ্টিতে যুগের চাহিদা বদলে যাবার অর্থ হল মানুষের প্রয়োজনসমূহ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ আজ থেকে তিনশ' বছর আগে মানুষের জন্য কোন সড়ক ও ট্রাফিক আইন প্রণয়ণের কোন প্রয়োজন ছিল কি? ট্রাফিকের কোন সমস্যা ছিল না। গাড়ি এসে এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের হাজারও বিষয় রয়েছে যা আগে ছিল না। কাজেই তার আইনও প্রয়োজন হয়নি। সমস্যাগুলো নতুন, এর নিয়ম-কানুনগুলোও নতুন।

এ কথা ঠিক যে, মানুষের জীবনের অবস্থা ও পরিস্থিতি পরিবর্তন হয় এবং মানুষের প্রয়োজনগুলোও বদলে যায়। কিন্তু বিষয়টিকে এত সরলীকরণ করা যায় না। মানুষের এক শ্রেণীর প্রয়োজন রয়েছে অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। আরেক শ্রেণীর প্রয়োজন রয়েছে পরিবর্তনশীল ও সাময়িক। মানুষের সকল প্রয়োজনই পরিবর্তনশীল- এ কথা ঠিক নয়। যে প্রয়োজনগুলো মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কিত সেগুলো অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন। পক্ষান্তরে যে প্রয়োজনগুলো মানব জীবনের ধরন-ধারণ

সম্পর্কিত সেগুলোই পরিবর্তনীয় ও সাময়িক। জীবনের ধরন-ধারণ অহরহ বদলে যাচ্ছে বলে এ কথার দোহাই দিয়ে আমরা বলতে পারি না যে, মানব জীবনের প্রাণ বা আত্মাও বদলে যায়। দীনী বিষয়াদি জীবনের আত্মাকে সম্বোধন করে, জীবনের ধরন-পদ্ধতিকে নয়। যদি ইসলামে অনুসন্ধান করে দেখা হয় তাহলে একটি জায়গায়ও পাওয়া যাবে না যেখানে ইসলাম জীবনের ধরন-কাঠামোর ওপর নির্ভর করেছে। কোথাও ইসলাম বলে না যে, 'জীবনের এ ধরনটাই আমি চাই। এর পরিবর্তন করলে চলবে না।' বরং সবসময় জীবনের অর্থ ও তাৎপর্য, এক কথায় জীবনের আত্মার ওপরেই ইসলাম নির্ভর করে। এটা ইসলামের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষ ও জগৎ একই রকম। এই যে বলা হয় জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল- এখানে 'সবকিছু' এভাবে বলা সঠিক নয়। প্রকৃতি হল জগতের পরিবর্তনশীল দিকের নাম। কিন্তু জগতের যদি একটি অপরিবর্তনীয় দিকও না থাকত, তাহলে এ নামটি ধারণ করাও অসম্ভব ছিল। যদি 'সবকিছুই' পরিবর্তনশীল হয়, (যেমনটা প্রাচীন যুগে হিরাক্লিটাস বলেছেন এবং আমাদের এ যুগেও অনেকে সে কথারই অনুসরণ করে চলেছেন) এবং কোন কিছুই যদি কোন অবস্থায় ও কোন দিক থেকেই দু'টি মুহূর্তে একরূপ থাকা অসম্ভব হয়, তাহলে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না এবং জগতে কোন নিয়ম-কানুনই বিদ্যমান থাকতে পারে না। কিন্তু এ জগতের এতসব পরিবর্তনশীল চেহারার পরও এর একটি অপরিবর্তনশীল চেহারও রয়েছে, যা জগতের পরিবর্তনশীল রূপটাকে বয়ে বেড়ায়। অর্থাৎ যদি উক্ত স্থির ও অপরিবর্তনীয় দিকটি না থাকত তাহলে এ পরিবর্তনশীল দিকটিরও অস্তিত্ব থাকত না। মুসলিম দার্শনিকবৃন্দ, যাঁরা সারবস্তুগত গতি (substancial motion) তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন, তাঁরাও জগতের এ অপরিবর্তনশীল দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। তবে এ প্রকৃতির একটি আত্মা রয়েছে, যে আত্মা শাশ্বত, চিরন্তন। মাওলানা রুমী এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বলেছেন :

'শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেল হে মহাবীর!
আর এসব গুঢ় কথা রয়ে গেল অমলিন, শাশ্বত
এ পানির নালায় বদলে গেছে পানির ধারা, কতবার,
বিপরীতে ঐ সূর্য দেখ অপরিবর্তিত, চির স্থির।'

গোটা বিশ্বে কিছু গুঢ় সত্য আছে যা অপরিবর্তনীয়। আরেকটি দিক আছে পরিবর্তনশীল। মানুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমাদের যদি একটি আত্মা ও একটি অপরিবর্তনশীল জীবন ও নির্দিষ্ট মন-মানস না থাকত তাহলে এ পরিবর্তনশীল তনুদেহও থাকত না। আজ যে আমরা আছি- সেই চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের আগের মানুষটাই তো আছি। এ সময়ের মধ্যে আমাদের এ গোটা শরীর কতবার পরিবর্তন হয়ে গেছে ও ঝরে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিছু অংশ ঝরে গেছে নখ ও দাঁত রূপে, যেগুলোর স্থান হয়েছে ময়লার আস্তাকুড়ে। আর কিছু অংশ রয়ে গেছে অন্যরূপে। যেমন আমাদের ত্বকের কোষগুলো খোসার মত ঝরে পড়েছে এবং নতুন কোষ সেখানে স্থান দখল করে নিয়েছে। এভাবে দেখা যাবে আমাদের সেই দশ বছর আগেকার দেহটি এতদিনে কোন আস্তাকুঁড়ে চলে গেছে তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু তারপরও আমরা আছি। এর কারণ হল আমাদের আত্মা অক্ষুণ্ন রয়েছে। মানবের সামাজিক জীবনও হুবহু এরূপ। মানুষের দেহের ন্যায় এবং গোটা জগতের ন্যায় তারও একটি আত্মা রয়েছে, যেমন রয়েছে একটি পরিবর্তনশীল দেহ।

ফিরে আসি প্রশ্নের কথায়। উপর্যুক্ত ভূমিকা সামনে রাখলে ইসলামের বিধি-বিধানের শাশ্বত হওয়ার রহস্য অনুধাবন করা কষ্টকর হবে না। পবিত্র কুরআন বলতে গেলে একটি মাত্র আয়াতেই এ রহস্য উন্মোচন করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইসলাম হল এমন একটি দীন যা সৃষ্টির নিয়ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এক কথায়, এসব নিয়ম ও বিধানের প্রণেতা স্বয়ং তিনিই যিনি সৃষ্টিরও স্রষ্টা। কাজেই এ নিয়ম ও বিধানাবলিকেও তিনি প্রণয়ন করেছেন সৃষ্টির অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের সাথে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যশীল করে। ইরশাদ হচ্ছে :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

'তুমি আল্লাহর প্রকৃতি অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।'[৩]

তিনি বলতে চান, দীন হল খোদায়ী সৃষ্টি। স্বয়ং দীন হল খোদায়ী সৃষ্টির সহজাত প্রকৃতি অনুযায়ী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ

'আর যা মানুষের জন্য উপাদেয় তা জমিনে থেকে যায়।[৪]

এ অবশিষ্ট থেকে যাওয়ার কারণ হল তা মানুষের জন্য উপাদেয়। এটি একটি সামগ্রিক ব্যাপার। এখন দেখতে হবে যে, ইসলামে কী কী জিনিস রয়েছে যা এ দীনকে সৃষ্টির সাথে ও সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বিষয়াবলির (principles) সাথে সামঞ্জস্যশীল করেছে।[৫]

প্রথমত ইসলাম আক্‌ল তথা বুদ্ধিবৃত্তির মৌলিকত্বে বিশ্বাস করে। নিঃসন্দেহে ইসলামের ন্যায় অন্য কোন দীন ও ঐশী গ্রন্থ পাওয়া যাবে না যেখানে আক্‌লকে এমন মৌলিকত্ব ও মূল্য দেওয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমরা আমাদের দীন সম্পর্কে ভাল প্রচারক হতে পারিনি। আপনি যখন ইসলামী ফেকাহ্‌র বই কিতাব খুলবেন, দেখতে পাবেন যে, যখন ইজতিহাদ ও ফতোয়া বের করার প্রক্রিয়ায় এর উৎসসমূহের তালিকা বর্ণনা করা হয়, তখন বলা হয়, উৎস চারটি। যথা- কিতাব, সুন্নাহ, ইজমা ও আক্‌ল। অর্থাৎ আক্‌লকে স্বতন্ত্রভাবে কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার কাতারে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আসলে, এটা ইসলামের একটি বড় গৌরবের বিষয় যে, সেই সূচনাকাল থেকেই এর আলেমগণ বলেছেন : আক্‌ল ও শরীয়তের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রয়েছে। একটি মূলনীতি (principle) স্থির করে তাঁরা বলেন :

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل

'আক্‌ল (বুদ্ধিবৃত্তি) যা নির্দেশ করে, ধর্মের শরীয়ত (শার্‌য়) তা-ই নির্দেশ করে। আর শরীয়ত যা নির্দেশ করে, আক্‌লও তা-ই নির্দেশ করে।' এ কথা দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হল : যদি সত্যই আক্‌ল একটি জিনিসকে উদ্ঘাটন করে, আর ধরুন আমাদের হাতে উক্ত বিষয়ে কোন কুরআন-হাদীসভিত্তিক সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে, তাহলে আক্‌লের ঐ নির্দেশই আমাদের এটা বুঝার জন্য যথেষ্ট যে, এটা ইসলামের নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর শার্‌য় অলঙ্ঘনীয়ভাবে যা নির্দেশ করে, আক্‌লও সেটাই নির্দেশ করে– এ কথার অর্থ হল কিছু গুঢ় জ্ঞান ও সংকেত রয়েছে, যদি আক্‌ল সেগুলো অনুধাবন করতে পারে তাহলে তা স্বীকার করে। অর্থাৎ ইসলামের বিধি-বিধান অপরিচিত ও ভিন্ন জগতের কিম্বা মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির নাগালের বাইরের কোন নিয়মের ভিত্তিতে প্রবর্তিত নয়; বরং মানুষের জীবনের প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের ভিত্তিতে প্রণীত, যা মনুষ্য বুদ্ধি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য। কাজেই 'শার্‌য় যা নির্দেশ করে,

আক্‌লও তাই নির্দেশ করে'– এ নীতি বলতে চায় যে, ইসলাম হল যুক্তিনির্ভর ধর্ম। খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসীরা ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কথা বলে থাকে যে, এ ক্ষেত্রে ঈমান হল আক্‌ল থেকে ভিন্ন। আসলে ঈমান থেকে আক্‌ল ভিন্ন নয়। ঈমান আক্‌ল থেকে ভিন্ন হবে, এমন কোন বক্তব্য ইসলামে নেই। আর এ ব্যাপারটিই ইসলামের ফেকাহর মধ্যে অপূর্ব এক শক্তি সঞ্চারিত করেছে। এ বিষয়টিই ইসলামী আলেম ও পণ্ডিতবৃন্দের জন্য একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রের সুযোগ করে দিয়েছে, যেখানে তাঁরা সমস্যাবলির বিধান নির্ধারণে আক্‌ল তথা বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ করতে পারেন। অতীতের বিভিন্ন যুগে ইসলামী ফেকাহ্‌র বিজয়ের পেছনে এটাই ছিল অন্যতম কারণ। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অঙ্গনে যাঁরা ইসলামী ফেকাহ নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন তাঁরা এর নমনীয়তা ও খাপ খাওয়ানোর অভাবনীয় গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, ইসলাম জীবন যাপনের বিশেষ কোন রূপ বা ধরনের দিকে দেখে না; বরং জীবনের আত্মার দিকেই তার দৃষ্টি। অর্থাৎ দ্বিতীয় যে কারণটি ইসলামের মধ্যে রয়েছে এবং যার সুবাদে জগতের পরিবর্তন ও উন্নতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়, সেটা হল, ইসলাম জীবনের ধরন-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করে না। কোন এক ধরনের বা এক ধাঁচের জীবনকে ইসলাম স্থায়ীভাবে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় না। ইসলামের লক্ষ্য জীবনের আত্মার দিকে। আর সে কারণেই ইসলাম জীবনের অগ্রযাত্রার সাথে কখনও সংঘর্ষে জড়ায় না। কেননা, বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি যে কাজটা করে তা হল জীবনের বাইরের উপকরণ ও ধরন-পদ্ধতিকে উন্নত করে দেয়।

এ পর্যায়ে দু'টি উদাহরণের সাহায্যে আধুনিকতার প্রশ্নে ইসলামের অবস্থানকে স্পষ্ট করার প্রয়াস চালান যাক।

এক. পবিত্র কুরআনের একটি বিধান হল :

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

'তোমরা একে অন্যের ধন বাতিল ভাবে ভক্ষণ কর না।'[৬]

মূলত অবৈধ লেনদেন এবং তদসূত্রে অর্থ গ্রহণের বিষয়ে এ নিষেধাজ্ঞা। ফকীহগণ বলেন, ইসলাম যেহেতু নাপাক দ্রব্যসমূহ হারাম করেছে, কাজেই তা কেনা-বেচা জায়েয নয়। এটা বাতিল লেনদেনের মধ্যে গণ্য হয়। যেমন রক্ত। সে যুগে রক্তের

ব্যবহার ছিল পান করার কাজে। ইসলাম রক্তপান নিষিদ্ধ করেছে। কাজেই সে যুগে রক্তের বেচাকেনা স্বভাবতই নিষিদ্ধ করা হত। কিন্তু যদি সময় বদলে যায় এবং রক্তের হারাম ব্যবহারের পরিবর্তে নানাবিধ উপকারী ও জীবনদায়ক ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়, যা ইসলাম অনুমোদন করে, তাহলে এর বেচাকেনার হুকুমও বদলে যাবে স্বাভাবিকভাবেই। যেমন এ রক্তের কথাই ধরুন। বর্তমানে এক মানুষের রক্ত অন্য মানুষের দেহে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলামের নিষেধাজ্ঞা ছিল, রক্ত অপবিত্র এবং অপবিত্র জিনিস খাওয়া হারাম। কাজেই খাওয়ার উদ্দেশ্যে রক্ত কেনা-বেচা করা হারাম এবং এতদ উপায়ে অর্জিত অর্থও হারাম। কিন্তু রক্তের অন্যান্য উপকারী ব্যবহার, যেমন মেডিকেল পদ্ধতিতে একের রক্ত অন্যের দেহে ব্যবহার করে জীবন রক্ষা করা, তাহলে সেক্ষেত্রে রক্ত কেনাবেচা নিষিদ্ধ হবে না। অতএব, দেখা গেল, উল্লিখিত আয়াতের নির্দেশ মতে রক্ত কেনাবেচা যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, আজ তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তা আর বাতিল লেনদেনের মধ্যে গণ্য নয়। কাজেই নিষিদ্ধ নয়। এখানে কুরআনের বিধান অক্ষুণ্ন ও শাশ্বত রয়েছে, বদলে গেছে শুধু হুকুমের বিষয়বস্তু। আর সেসূত্রে ঐ বিষয়ের বিধানও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এটা ইসলামের নাস্‌খ (রহিত) হয়ে যাওয়া নয়। ইসলামের বিধি-বিধান অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত। বদলে যায় বিষয়বস্তু। তখন উক্ত বিষয়বস্তুর হুকুমও বদলে যায়।

দুই. ইসলামের ফেকাহ শাস্ত্রে একটি অধ্যায় রয়েছে 'সাব্‌ক ওয়া রামায়াহ্' শিরোনামে। এর অর্থ হল 'সওয়ারী বিদ্যা ও তীরন্দাজি।' প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব কাজ হল অশ্ব চালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। তীরন্দাজিও একটি মুস্তাহাব কাজ। এখন কেউ বলতে পারে, ইসলামী ফেকাহর এ অধ্যায়টি আধুনিক যুগে অকেজো হয়ে গেছে। কারণ, এ যুগে না অশ্ব চালনার কোন প্রয়োজন পড়ে, আর না তীরন্দাজির।[৭] অথচ গভীর গবেষণায় দেখা যাবে, এ বিধানের আবেদন আধুনিক যুগে বিন্দুমাত্র হ্রাস তো পায়নি, উপরন্তু এর অপরিহার্যতাই প্রমাণিত হবে। কারণ, 'সাব্‌ক ওয়া রামায়াহ' অধ্যায়টি ফেকাহ্‌য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কুরআনের একটি শাশ্বত বিধানের প্রেক্ষিতে। ইরশাদ হচ্ছে :

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ

'এবং তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত কর।[৮]

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম এবং মুসলিম জাতির প্রতিরক্ষায় একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। মুসলমানরা শত্রুর মোকাবিলায় সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী থাকবে। তাই সেদিন অশ্বচালনা ও তীরন্দাজি সুন্নাত করা হয়েছিল যাতে তার সৈন্যরা রণাঙ্গণে অস্ত্রসজ্জিত ও শক্তিশালী থাকে। এ বিধানের একটি আত্মা রয়েছে যার ওপরে অশ্বচালনা ও তীরন্দাজির জামা পরানো হয়েছে। আত্মা অপরিবর্তনীয়, রহিত হওয়ার নয়। কিন্তু ওপরের জামাটা পরিবর্তনীয়। পরবর্তীকালে যখন 'তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যথাসম্ভব শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত কর' নির্দেশটি বাস্তবায়নের জন্য অন্য কোন ধরন-পদ্ধতি এসে সে স্থান দখল করবে, তখন এ হুকুম তার জন্য পরিবর্তিত হবে।[৯]

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম মানব জীবন ও সমাজের প্রয়োজনগুলোকে দু'ধরনের মনে করে : পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল। যে প্রয়োজনগুলো পরিবর্তনশীল তার জন্য ইসলামের বিধানগুলোও পরিবর্তনশীল ও অতিশয় নমনীয়। কিন্তু যেগুলো অপরিবর্তনশীল, সেগুলোর বিধান অপরিবর্তনীয় রেখেছে। সর্বোপরি, উক্ত পরিবর্তনশীল বিধানগুলোকে বিজড়িত করেছে অপরিবর্তনশীল বিধানগুলোর অধীনে। ফলে একজন মুসলিম পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি বলবেন, এখন বিষয় বদলে গেছে। তিনি বলে দিবেন : এখন আগ্নেয়াস্ত্রের সময় এবং জঙ্গি বিমান, মিগ ও ফ্যান্টমের যুগ। তাই সেটাই প্রস্তুত কর। কারণ, তীর বা ধনুকের প্রতি ইসলামের আলাদা কোন আকর্ষণ নেই। ইসলাম শক্তি অর্জন ও সংহতির কথা বলে। এটাই এ বিধানের আত্মা। আর তীরধনুক সংগ্রহ করবে নাকি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করবে, এটা দেহ ও শরীরতুল্য, যা যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সূরা যুমার, আয়াত নং ৩০
২. সূরা হিজ্‌র, আয়াত নং ৯
৩. সূরা রূম, আয়াত নং ৩০
৪. সূরা রা'দ, আয়াত নং ১৭
৫. পরিবর্তন হল সৃষ্টির এরূপ একটি বিষয় (principle)।
৬. সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮৮
৭. শখের বশে কিম্বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথা ব্যতিক্রম।
৮. সূরা আনফাল, আয়াত নং ৬০
৯. আজ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বাধুনিক সামরিক শক্তিকে সজ্জিত হওয়ার কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

মানুষের সারসত্তা

অস্তিত্ববাদের[১] মূল প্রেক্ষিত : একটি সাদরায়ী অনুসন্ধান

আলী রেযা রওগনি মোভাফ্‌ফাক

[এ নিবন্ধে মানুষের Essence তথা সারসত্তা সম্পর্কে অস্তিত্ববাদী দর্শনের মতবাদসমূহ এবং মুসলিম চিন্তাবিদগণ ও মরহুম সাদরুল মুতাআল্লেহীনের প্রচলিত মত-অভিমতের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সাদরুল মুতাআল্লেহীন- যিনি Movement of substances তথা 'সারবস্তুর গতিশীলতা' থিওরী উপস্থাপন এবং ব্যক্তি মানুষের সারসত্তার পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে প্রচলিত চিন্তাবিদদের থেকে ভিন্ন এক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তা একদিকে যেমন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি এ মতবাদ বিদ্যমান অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটির নিরসনকারী। সাদরুল মুতাআল্লেহীনের এ তত্ত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্ব আসরে পরিবেশন করার মত প্রয়োজনীয় প্রশস্ততার অধিকারী এবং এটি নৃ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামী মতবাদ হিসাবে উপস্থাপিত হতে পারে। অবশ্য এ ক্ষুদ্র পরিসরে এ সম্পর্কিত সাদরায়ী তত্ত্বের পরিপূর্ণ, বিস্তারিত ও চুলচেরা ব্যাখ্যা তুলে ধরা সম্ভব নয়, তবে গবেষকদের জন্য অধিকতর গবেষণা ও অনুসন্ধানের দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হতে পারে নিঃসন্দেহে।]

ভূমিকা

Existentialism বা অস্তিত্ববাদ হল পাশ্চাত্যের একটি বিখ্যাত মতবাদ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যার অনেক সমর্থক গড়ে ওঠে এবং এখনও সমসাময়িক বিশ্বে তার একনিষ্ঠ সমর্থকের অভাব নেই। এ মতবাদের মূল্য এত বেশি যে, COPLESTON এর ভাষায় একে সমসাময়িক পাশ্চাত্যের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের একটি বলা যেতে পারে। যে বিষয়টি অস্তিত্ববাদী মতাদর্শকে অন্যান্য মতবাদ থেকে পৃথক করে তা হচ্ছে এ মতবাদের পন্থা ও পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের অভিমত প্রকাশের চিরাচরিত ও সাধারণ ধারা থেকে এক প্রকার স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হওয়া। যদিও দাবি

করা হয়েছে যে, অস্তিত্ববাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মতাদর্শ অর্থাৎ Positivism বা দৃষ্টবাদেও অতীত ধারার প্রতি এক প্রকার প্রতিবাদ বিদ্যমান। তবে মনে হয় অস্তিত্ববাদ নিদেনপক্ষে পাশ্চাত্য যে অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে, সেদিক থেকে অভিনব ও নতুনতর মতামতই উপস্থাপন করেছে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মতবাদসমূহ এ কারণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও নবতর যে, তাঁরা অন্য সবকিছুর চেয়ে মানুষের Reality তথা বাস্তবতাকে চিনতে ও তার আসল চাহিদাসমূহের প্রতি মনোযোগী হতে চেষ্টা করেছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোযোগ যেহেতু পাশ্চাত্যের আধুনিক ও যান্ত্রিক সভ্যতার জগতে অবর্ণনীয় অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়েছে, সে কারণে এ মতবাদের মূল্য উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত করে তুলছে। অপরদিকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী চিন্তাবিদদের জন্য তাঁদের ত্রুটিমুক্ত, স্বচ্ছ ও প্রাণময় চিন্তাকে উপস্থাপন করার একটি অবারিত সুযোগ করে দিতে পারে; যা নৃ-বিজ্ঞানের জ্ঞান-গবেষণায় সৃষ্ট পিপাসা নিবারণে সহায়ক হতে পারে এবং যা এ পথে একটি স্পষ্ট বক্তব্য এবং একটি সূক্ষ্ম ও পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে।

এ নিবন্ধে অস্তিত্ববাদের গুরুত্বপূর্ণ Basic perspectives তথা ভিত্তিগত প্রেক্ষিতসমূহ, যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের সারসত্তায় প্রত্যাবর্তন করে, সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সেগুলোর বিভিন্ন দিক-উপদিক উন্মোচন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হয়েছে, যাঁরা পূর্ববর্তী প্রেক্ষিতের ক্ষেত্রে মতামত ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন।

সাদরায়ী অনুসন্ধানের আওতায় সাদরুল মুতাআল্লেহীনের মতামত পর্যালোচনার আগে মানুষের সারসত্তা সম্পর্কিত ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রচলিত মতামতসমূহের প্রতি আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ কাজটি আমাদের এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মনোসংযোগে সাহায্য করবে। আর চূড়ান্ত পরিণামে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের (দার্শনিক) মতামত ও তত্ত্ব, যা আজ সম্ভবত সামান্যই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা চারটি শিরোনামে ও দু'টি মন্তব্য সহকারে ব্যাখ্যা করা হবে।

অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি

অস্তিত্ববাদী দর্শনে যে বিষয়টি চিন্তাবিদদের বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে এবং মানুষের সারসত্তা সম্পর্কে যা কেন্দ্রিয় রূপে আলোচিত হয় সেটা হল Existence

precedes essence বা 'অস্তিত্ব সত্তার অগ্রবর্তী' তত্ত্বটি। এ তত্ত্বটি, যাকে পারিভাষিক অনুবাদে Origin of existence বা 'অস্তিত্বের মৌলিকতা' বলা হয়ে থাকে, এটা এমন যে, বিভিন্ন মতবাদের বিশেষজ্ঞরা যখন অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞা ও পরিচিতি প্রদান করতে চান, তখন সর্বপ্রথম এরই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। কেউ কেউ আবার Philosophy of existence বা 'অস্তিত্ব দর্শন' নামে খ্যাত এ মতবাদটির নামকরণ খোদ এ তত্ত্ব থেকেই গৃহীত হয়েছে বলে মনে করে থাকেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে মানুষের সারসত্তার ব্যাখ্যার মূল কাজ নির্ভর করে এ কেন্দ্রবিন্দুতুল্য তত্ত্বটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ওপর। নিম্নে এ তত্ত্ব সম্পর্কিত কতিপয় ব্যাখ্যার প্রতি ইশারা করা হল :

১. Routledge Encyclopedia

অস্তিত্ববাদীরা বিশ্বাস করে, মানুষ উদ্দেশ্য[২] (গন্তব্য) ও সারবস্তু (Substance) শূন্য– যা পূর্ব থেকে ঈশ্বর কিম্বা প্রকৃতি তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে থাকবে। এ সূত্রটি আমাদের এ দিকের প্রতি মনোযোগী করে তোলে যে, আমরা 'এমন কেউ' বা 'এমন কিছু' যা আমাদের কর্মধারায় (অর্থাৎ কর্মে ও পথে চলতে চলতে) রূপ লাভ করে থাকে।[৩] আর এটিই সে বিষয় যা সার্ত্রে[৪] অস্তিত্ববাদের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানুষের জন্য অস্তিত্ব (existence) হল সত্তার (essence) অগ্রবর্তী। এর অর্থ হল আমরা প্রথমে সহজভাবে অস্তিত্বশীল (আমরা নিজেদের এমন এক ভুবনে খুঁজে পাই যা আমরা নির্বাচন করিনি)। অতঃপর আমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবনে যা কিছু করি তার প্রেক্ষিতে নিজের পরিচয় তথা স্বভাব-সত্তাকে রূপায়িত করে থাকি। অতএব, আমাদের সারবস্তু (Substance) নির্বাচন করা হয়, (তা) প্রদত্ত (কিছু) নয়। (Craig, Edward, 2000:265)

২. Encyclopedia of Britannica

অস্তিত্ববাদ একটি মতবাদ হিসাবে অন্য যেসব মতবাদে মানুষকে পূর্ণ স্বরূপে দেখা যায় এবং তাকে জানা কিম্বা চিন্তার জন্য তার সরল সারবস্তু (simple substance)-তে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক হয়, সেসব মতবাদের পরিপন্থী। (Norton, 1994: v4, p 631)

উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো সাধারণভাবে আমাদেরকে এ ফলাফলে পৌঁছে দেয় যে, 'অস্তিত্ব সত্তার অগ্রবর্তী' তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ধারণার বিপরীতে মানুষ হল সারসত্তাশূন্য। অন্য কথায়, পূর্বেকার ব্যাখ্যা ও অন্যান্য সার্বিক ব্যাখ্যার মাঝে অভিন্ন দিক হল- একজন মানুষ, যা সারসত্তা হিসাবে তার মধ্যে কিছু স্বতন্ত্র স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের উন্মেষক হয়, তা অধিকারী হয় না, শূন্য থাকে; এবং এমন কোন সত্তা থেকে শূন্য থাকে, যা পূর্ব-পরিকল্পিত। এ ফলাফল অস্তিত্ববাদের সাথে ভিত্তিগত সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এটি দেখতে হবে যে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের দৃষ্টিতে এ মতবাদ কি কাঙ্ক্ষিত ব্যাপকতার অধিকারী নাকি অধিকারী নয়?

এ মর্মে কতিপয় মতামতের প্রতি ইশারা করা যাক যেগুলো মানুষের সারসত্তাশূন্যতার কথা বলে এবং পূর্বোক্ত ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই এক প্রকার সমর্থনস্বরূপ :

১. নীটশে[৫]

ফ্রেডরিক নীটশে হলেন সেই দার্শনিক দলের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা মানুষের জন্য পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কোন নিজস্বতা (self) বিদ্যমান থাকার প্রবক্তা ছিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা তুলে ধরার জন্য তাঁর চিন্তার দু'টি মূল বিষয়ের প্রতি ইশারা করা যেতে পারে :

প্রথমত : তিনি মানুষের ব্যক্তিত্বের বর্ণনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যরথুস্ত্রীয় বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন, যা তাঁর ভাষায় শ্রেষ্ঠ মানব (superman)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদদাতা : 'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ মানবের কথা শেখাব। মানুষ হল এমন এক অস্তিত্ব যাকে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে হবে।' (Nietzsche, 1973: p. 124)

মানুষের প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে আরও অনেক অস্তিত্ববাদী দার্শনিকের ন্যায় এক অনিশ্চল ও পরিবর্তনশীল মানুষকে স্বীকার করতে প্রবৃত্ত করে, যে মানুষের পরিবর্তন সাধিত হয় তার নিজের হাতে। পরের যে বিষয়টি যা অস্থির খুদীকে বেশি বেশি প্রমাণ করে তা হল ঈশ্বর ও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি : 'ঈশ্বর মারা গেছেন।'

এ উক্তি সম্পর্কে নানা জনে নানা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং কখনও বা পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে, তবে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এই 'চাবিকাঠি'তুল্য

তাৎপর্যটি যে, মানুষ নিজেই নিজের মূল্যসমূহকে নির্ধারণ করতে পারে। আর এর ভিত্তিতে সে নিজের স্বভাব তৈরি করতে পারে। নীট্‌শের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য এরূপ সামর্থ্য মেনে নেওয়া সেই বিশ্বাসের পরিপন্থী যে বিশ্বাসে মূল্যসমূহের স্রষ্টা এবং মনুষ্য স্বরূপ (human reality) এর উন্মেষক হিসাবে কোন অস্তিত্বকে (ঈশ্বর) স্বীকার করা হয়।

নীট্‌শে চাইতেন নিজে (oneself) থাকতে। নিজ স্বভাব সৃষ্টি করতে এবং নিজের স্বতন্ত্র মূল্য ও তাৎপর্যকে নির্ধারণ করতে। তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা পরাজয়ের চেয়েও ভয়ানক ছিল এবং তিনি যেসব লক্ষ্য-আদর্শ লালন করতেন সেগুলোর পরিপন্থী ছিল। অন্য কথায়, নীট্‌শে এ প্রয়াসে ছিলেন যাতে ঈশ্বরকে নাকচ করার মাধ্যমে মানুষ তার ক্ষমতাকে বিশ্বে পরাক্রমশালী স্রষ্টার স্থলাভিষিক্ত করতে সক্ষম হয়। যে মানুষ নিজেই স্বীয় সারসত্যের (reality) ও স্বীয় মূল্যের স্রষ্টা হতে পারবে।

এ শ্রেষ্ঠ মানব (Superman)-এর আবির্ভাবের জন্য ও নীট্‌শের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব রূপলাভ করার জন্য এবং যাতে মানুষ স্বীয় মূল্য(বোধ) ও তাৎপর্য সচেতন স্রষ্টা হয় সেজন্য অবশ্যই যেন ঈশ্বর আমাদের অবচেতন অন্তঃপুরে মৃত্যুবরণ করে থাকেন। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২)

২. হাইডেগার[৬]

মার্টিন হাইডেগারের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে যা অস্তিত্ব ও সারসত্তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে এবং চূড়ান্ত পরিণতিতে মানুষের সারসত্তা না থাকার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। উক্তিটি হল : Human essence is hidden in his existence অর্থাৎ 'মানুষের সারসত্তা নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বে।' (Heidgger, 1962, p. 67) এ উক্তি প্রতিপন্ন করে যে, মানুষের পৃথক ও স্বাধীন সত্তাসম্বলিত মূল্যবান সারসত্তা বলতে কিছু নেই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানব অস্তিত্ব, যা একটি মৌল বিষয় হিসাবে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এবং হাইডেগারের ভাষায় যাকে 'Dasein' (বস্তুগত সত্তা) বলে আখ্যায়িত করা হয়, তা সর্বদাই (অস্তিত্বমান) থাকার পথেই আছে এবং যখন আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ গুণবৈশিষ্ট্যকে হারাব তখন কস্মিনকালেও আমরা মানব অস্তিত্বকে ধরতে পারব না। তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকারী অংশগুলো সম্ভাবনাসমূহ থেকে তৈরি

হয়েছে, গুণবৈশিষ্ট্য থেকে নয়। হাইডেগারের মানব অস্তিত্বে এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে যে, মানুষ অপরাপর অস্তিত্বমানদের থেকে ভিন্ন এবং তাদের মত 'সারসত্তাবলি'র অধিকারী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক টুকরো পাথরকে তার বৈশিষ্ট্যাবলি, যেমন বর্ণ, কাঠিন্য, রাসায়নিক মিশ্রণ ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত করার মাধ্যমে তার একটি উপযুক্ত বর্ণনা প্রদান করা যায়। কিন্তু Dasein (বস্তুগত সত্তা) এর এ ধরনের কোন স্থায়ী সারসত্তা (essence) নেই।

৩. সার্ত্রে

জ্যাঁ পল সার্ত মানুষের সারসত্তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন এভাবে :

'অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা যেভাবে বলে থাকেন মানুষ যদি সেভাবে সংজ্ঞায়নযোগ্য না হয় তাহলে সেটা এ কারণে যে, মানুষ শুরুতে Nothing তথা কিছুই না। সে কিছু হবেও না যদি না পরবর্তীকালে হয়। সেক্ষেত্রে সে ঠিক সেটিই হবে যা সে নিজের থেকে তৈরি করে।' (Sartre : 1376, p. 23) তিনি সত্যিকার 'অস্তিত্ব সারসত্তার অগ্রবর্তী' তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং স্পষ্টভাবে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন যে, 'প্রথমে থাকে মানুষ, তারপর হয় এ বা সে... মানুষের নিজের স্বতন্ত্র substance বা 'সারবস্তু'কে সৃষ্টি করতে হবে।'

সার্তের বক্তব্যে যে কথার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে ফুলিকে বিশ্বাস করেন যে, আমাদের (দ্বারা যা) সৃষ্টি (তা) কোন universal (সার্বিক) সত্তা নয়; বরং এক আত্মগত সত্তা হিসাবে গণ্য হয় যা আমাদের নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি 'নির্দিষ্টরূপে মানুষের অভ্যন্তরে সারসত্তা না থাকা'– এ ভিত্তি থেকে এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মানুষের সাথে জীবনযাপনের প্রথম থেকেই কিছু স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কল্পনার কারণে পরাজয় ও ব্যর্থতাসমূহ, এমনকি বিজয়সমূহও তারই কৃতিত্বের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়। অথচ প্রত্যেক সাফল্য কিম্বা ব্যর্থতাই কেবল মানুষের কর্ম ও নির্বাচনের ধরনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। এটিই সবকিছু। 'অস্তিত্ববাদ বলে থাকে নীচ ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট মানসিক অবস্থার কারণে এরূপ হয়নি; বরং সে নীচ। কারণ, স্বীয় কর্ম দ্বারা সে নিজেকে নীচ করেছে। কেউ-ই সহজাতভাবে নীচ্ হয়ে সৃষ্টি হয়নি। একজন দুর্বল মানসিকতার লোকের জন্য সর্বক্ষণ এ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, সে আর দুর্বল মানসিকতার থাকবে না। যেমনভাবে বীরের জন্যও এ

সম্ভাবনা রয়েছে যে, বীরত্বের অবস্থা থেকে বিরত হবে।' (সার্ত্রে, ১৩৭৬, পৃ. ৪১) কাজেই এ ফলাফলে উপনীত হওয়া যায় যে, 'বেঁচে থাকার অর্থ নির্বাচন। আর নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্বাচন করার অর্থ হল নির্বাচনের দ্বারা নির্দিষ্ট পন্থায় (অন্য পন্থায় নয়) কাজ করার মাধ্যমে নিজেকে প্রজাতিগত (specific) সার্বিক অবস্থান থেকে আত্মগত ব্যক্তিক অবস্থানে বেছে নিয়েছি। সুতরাং আমরা এ অবস্থা এড়িয়ে চলতে সক্ষম নই যে, সর্বদা এমনভাবে কাজ করি যেন (কাজ করার মাধ্যমে) আমাদের নিজেদের প্রতি সারসত্তা (essence) আরোপ করি।' (ম্যাথিউজ, ১৩৭৮, পৃ. ৯৯)

উপর্যুক্ত দার্শনিকদের মতামত থেকে এবং এমনকি অন্যান্য দার্শনিকের মতামত থেকেও প্রাপ্ত ফলাফলকে শীর্ষস্থানীয় অস্তিত্ববাদী দর্শনের ব্যাখ্যাতা ম্যাক কেভারী'র এ উক্তির মধ্যে সংক্ষেপ করা চলে, যিনি বিশ্বাস করেন : 'এমন কোন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক নেই যিনি মানুষের মধ্যে নিশ্চল কিম্বা পূর্ব থেকে নির্দিষ্টকৃত সারসত্তার প্রতি ইশারা করে থাকবেন।' (ম্যাক কেভারী, ১৩৭৬, পৃ. ৫৩)

দ্রষ্টব্য

অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দু'দিক থেকে অতীত ও বর্তমান দর্শনের সাধারণ রীতির বিরুদ্ধ বলে পরিগণিত। প্রথমত : অ্যারিস্টটলের ন্যায় দার্শনিকরা, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ওপর রাজত্ব করতেন এবং বিশেষ করে মধ্যযুগীয় সময়ে যে রাজত্বের দাপট একটু বেশিই ছিল এবং যার ভিত্তিতে মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ও নিশ্চল সারসত্তা বিবেচনায় নেওয়া হয়, তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যায় উপস্থিত মানুষ অন্যান্য অস্তিত্বশীলের মতই কেবল তখনই অস্তিত্বমান হয় যখন সারবস্তুর (substance) অধিকারী থাকে। আর যেহেতু সারবস্তু (substance) ও সারসত্তা (essence) হল অস্তিত্বের (existence) উন্মেষস্থল, কাজেই যা কিছু সারসত্তা ও সারবস্তু হবে না, তা আদতেই বাহ্যিক অস্তিত্ব লাভ করবে না। (COPLESTON : ১৩৭৫, পৃ. ৩২২)

মানুষের সংজ্ঞাও অন্যান্য বাহ্য অস্তিত্বশীলের ন্যায় সত্তাগতভাবে এবং Lower Species (বা অধ:স্তরীয় প্রজাতি তথা শ্রেণী)-তে বিভাজিত করার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। এ কারণে মানুষের reality তথা বাস্তব স্বরূপ যে দু'টি অংশের দ্বারা গঠিত অর্থাৎ 'পশুত্ব' এবং 'চিন্তাশীলতা'- এ দু'টির প্রথমটি তার জাতি (genus) নির্দেশক, আর দ্বিতীয়টি তার প্রজাতি নির্দিষ্টকারী বিভাজক (differentia)। এ দু'টির একটি

অভিন্ন ও যৌথ প্রকৃতি হিসাবে মানব প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান। 'চিন্তাশীলতা' বিভাজকটি (differentia) এমন এক প্রজাতিবদ্ধকারী যা মানুষকে পশুত্বের (যে পশুত্ব অন্যান্য পশুর মধ্যেও অভিন্নভাবে বিদ্যমান) বৃহত্তর জাতির (genus) সারি থেকে আলাদা করে ফেলে। (Audi, 199: p. 45) এই প্রজাতি বিন্যাস থেকে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার অস্তিত্বগত সংজ্ঞা ও তার নির্দিষ্ট সারসত্তার মূলে অন্যান্য অস্তিত্বশীল এবং পশুর মতই, তাদের সাথে কোন পার্থক্যই তার নেই। যদি পার্থক্য থাকে তাহলে সেটা রয়েছে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার বিষয়বস্তুতে (content)। এটাও আবার সকলের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান, এমনরূপে যে, পশুসমূহ এবং জিনিসসমূহও একে অপরের তুলনায় বিষয়বস্তুগত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

দ্বিতীয়ত : এক পরিবর্তনশীল, অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় সারসত্তা, যা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের অভিমত অনুযায়ী মানুষের কর্ম ও আচরণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং তার দ্বারাই তৈরি ও সংঘটিত হয়– এর ভিত্তিতে জড়বাদের প্রতি পাশ্চাত্যের যে আগ্রহ ও ঝোঁক, একান্ত জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তার বিস্তর পার্থক্য। অথবা কমপক্ষে কিছু কিছু দিকের বিচারে সাজুয্যপূর্ণ নয়। যেমন, সার্তে নিজের অভ্যন্তরমুখী হওয়ার প্রতি ইশারা করেন এবং বলেন : 'মানুষ অন্য সব কিছুর চেয়ে নিজের অন্তরমুখিতায় বেশি বাঁচে।' (সার্ত্রে : ১৩৭৬, পৃ. ৩০) আর এ মর্মে তাঁর নিজের জড়বাদী না থাকার কথা অস্বীকার করেন। অবশ্য জড়বাদী মতাদর্শ গ্রহণ না করার ওপর তাঁর গুরুত্বারোপের (যেমনটা এ গ্রন্থে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে) অর্থ এটি নয় যে, তিনি আত্মা ও বাস্তববাদকে মেনে নিয়েছেন।

সাদরায়ী দৃষ্টিভঙ্গি

এবার সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি চারটি আলাদা শিরোনামে এবং দু'টি সম্পূরক মন্তব্য সহকারে আলোচনা করা হল :

১. যা কিছু অজড় নয় তা অনিশ্চল

সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিতে সকল corporeal বা দেহী সত্তাই নিশ্চল ও স্থির নয়; বরং গতিশীল। তাদের এ গতি কোন সরল পরিবর্তনে শেষ হয় না। তাঁর দৃষ্টিতে এসব জিনিসের গতির প্রকৃত স্বরূপ নতুন হওয়া ও মূল সত্তার পরিবর্তনে

প্রতিফলন ঘটে। এ বক্তব্যটি, যা substantial motion বা 'সারবস্তুগত গতি' তত্ত্ব নামক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে তোলে, এটি ইসলামী দর্শনে অতিশয় বিস্ময়জনক বিবর্তন সংঘটিত করেছে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সাদরুল মুতাআল্লেহীন প্রমাণ করেন যে, এমনকি 'বস্তু' (matter) এবং 'রূপকাঠামো' (form)-এর অ্যারিস্টটলীয় principle অনুযায়ীও আমাদের মানতে হবে যে, জগতের substances বা সারবস্তুসমূহে এক মুহূর্তও নিশ্চলতা বা স্থিরতা থাকে না। এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন দার্শনিকরা যা ধারণা করতেন তা থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাঁরা এমনকি (রূপান্তরিত) হওয়াকে দু'টি অসম্ভব বস্তু (যেমন অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব)-এর একসাথে একত্র হওয়ার মত মনে করতেন এবং 'স্ব-পরিচয়মূলক' principle এর বিরুদ্ধ বলে গণ্য করতেন। এ বিশ্বাস হেগেলের ন্যায় বিখ্যাত পশ্চিমা চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সাদ্‌রা নিশ্চলতা ও স্থিরতাকে শুধু অদেহী ও অবস্তুগত জিনিসের বিষয় বলে মনে করেন এবং বস্তুগত বিষয়সমূহের reality তথা বাস্তব স্বরূপকে সঞ্চরণশীল ও পরিণত হওয়া এবং পরস্পর বিরুদ্ধ কোন কিছুর মধ্যে সম্মিলন ঘটা ব্যতিরেকেই অস্তিত্ব (being) ও অনস্তিত্ব (nothing)-এর মধ্যে এক প্রকার একত্রীকরণ ও সমন্বয় বলে গ্রহণ করেন। (আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তজা মোতাহহারী, ১৩৬৯, পৃ. ২১১)

পূর্ববর্তী মতটি যা কিছু অস্তিত্বশীল (যেমন মানুষের), তাদের সারসত্তা সম্পর্কে অনেক কাজে আসতে পারে। যেহেতু মানুষ কোন অজড় সত্তা বলে পরিগণিত হয় না, কাজেই অবিরাম পরিবর্তন ও রূপান্তর (becoming)'র মধ্যে এবং (একটি মতানুসারে যাকে বলে) 'হওয়া'র মধ্যে রয়েছে। এ রূপান্তর মানুষের গঠনের সূচনাপর্ব অর্থাৎ বীর্য থেকে শুরু হয় এবং ক্রমিক পূর্ণতার যাত্রা পথে জড় থেকে উদ্ভিদে এবং উদ্ভিদ থেকে পশুত্বে, অতঃপর পশুত্ব থেকে মানবে পরিণত হয়। আর মনুষ্যত্বেও রয়েছে নানা মাত্রার পূর্ণতার কামনা। (অশতিয়ানি, ১৩৮০, পৃ. ৬৯)

২. গতিশীল শ্রেণীতে ক্যাটাগরিতে প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার প্রজাতি (species) ও শ্রেণী (class) গত পার্থক্য

উদ্ভিদ, পশু ও মানব– এর সবগুলো পর্যায়েই মানুষ যখন পরিবর্তন ও রূপান্তরের অবস্থায় থাকে, তখন প্রকৃতপক্ষে তার জাত বা সত্তাই রূপান্তরিত হতে থাকে। যেমনভাবে কোন জিনিসকে যখন তার কালো অবস্থার বৃদ্ধি ঘটানো হয় তখন তার সত্তা রূপান্তর লাভ করে এবং বৈশিষ্ট্যের এ পরিবর্তন শুধু তার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না : 'এটা নয় যে, উদাহরণ স্বরূপ কল্পনা করব, একটি জিনিস কালো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে এবং মুহূর্তে মুহূর্তে তার কালো অবস্থার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সেক্ষেত্রে এটি মনে করা ভুল যে, প্রাথমিক সত্তা অবশিষ্ট রয়েছে এবং তার ওপর আরও কিছু যোগ হচ্ছে। কেননা, এটি এ দুই অবস্থার বাইরে নয়– হয় প্রথম সত্তাটি কালো ভিন্ন অন্য কিছু। সেক্ষেত্রে কালো অবস্থা তার কালো থাকার ব্যাপারে 'হওয়া' অর্জন করে না; বরং সত্তার বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপরে আরেকটি বৈশিষ্ট্য যোগ হয়। আর না হয় প্রথম সত্তাটি হল ঠিক সে কালো অবস্থা। সেক্ষেত্রে এটি বলা যায় না যে, একই স্থানে কোন পার্থক্য ছাড়াই দু'টি কালো অবস্থা বা প্রকৃতি রয়েছে। এটি সম্ভবপর নয়, অসম্ভব।' (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৭৮, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩)

উপর্যুক্ত কথাগুলোর ফলাফল দাঁড়ায়, গতিশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসত্তাসমূহ প্রজাতি (species) ও শ্রেণী (class) গতভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ। কেননা, তার গতি ও সঞ্চরণ কালে প্রতিক্ষণে এক সত্তা থেকে আরেক সত্তায় পরিণত হয়। কাজেই গতির সময় আমরা অসংখ্য সত্তার সম্মুখীন হই যা মুহূর্তে মুহূর্তে উৎপত্তি লাভ করে থাকে এবং তদসত্ত্বেও একে অপর থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। মোল্লা সাদরা এ প্রসঙ্গে বলেন : 'একটি শ্রেণীতে গতি সংঘটিত হওয়ার অর্থ হল, যে বিষয়টিতে গতি সংঘটিত হয়, প্রতিটি মুহূর্তেই উক্ত শ্রেণী থেকে এমন এক স্বতন্ত্র (individual) গতি বর্তমান থাকবে যা অন্য ব্যক্তির সাথে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্য মুহূর্তে রয়েছে) প্রজাতি, শ্রেণী ও অন্যান্য দিক থেকে বিরোধী।' (প্রাগুক্ত)

৩. গতি সারসত্তায় (essence-এ), অস্তিত্বে (existence-এ) নয়

আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইশারা করতে হয় যে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের পক্ষ থেকে যে গতির কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে সেটা বস্তুর কোন্‌টির মধ্যে? অর্থাৎ সারসত্তায় নাকি অস্তিত্বে? তিনি গতির আলোচনায় এ বক্তব্যের প্রতি ইশারা করেন যে, গতি কখনও অস্তিত্বের মধ্যে স্থান পায় না; বরং তার সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র হল সারসত্তা। সেখানেই গতি ও পরিবর্তন সূচিত হয়।

যদি মেনে নেই যে, গতি একটি বিষয়বস্তুতে সত্তার পরিবর্তনের কারণ হয়, তাহলে আর বলা যাবে না যে, গতি অস্তিত্বে সংঘটিত হয়। এ কথা উভয় মূলনীতি (অস্তিত্বের মৌলিকতাবাদ ও সারসত্তার মৌলিকতাবাদ) অনুযায়ী সঠিক। অস্তিত্বের মৌলিকতাবাদ অনুযায়ী অস্তিত্ব খোদ বিষয়বস্তু, আর তার reality তথা বাস্তব স্বরূপ

হল স্বয়ং (উক্ত) বিষয়ে। সুতরাং কিভাবে তার বিষয়বস্তু অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তার পরিবর্তন (রূপান্তরের) কথা বলা যায়? (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪)

যে বিষয়টি মরহুম সাদরাকে গতি অস্তিত্বে নয়, বরং সারসত্তায় থাকার প্রবক্তা বানিয়েছে, সেটি হল এই যে, কোন জিনিসের সারসত্তা হল আপতিত ব্যাপার। কাজেই গতি যদি তার মধ্যে প্রবহমান হয়, তবে একটি জিনিসের একত্বের (বা অভিন্নতার) ভিত্তিমূলে কোন ক্ষতি হয় না। এ কারণে 'বস্তুর গতি'- যা সত্তার পরিবর্তনের কারণ হয় এবং 'সচল সারসত্তার অবশিষ্টি'– এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। অথচ যদি বলি গতি সংঘটিত হয় অস্তিত্বে, তাহলে গতি ও পরিবর্তনের কথাও আর বলা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ : যদি আমরা বলি মানুষ সর্বদা পরিবর্তনশীল, আর তার এ পরিবর্তনকে তার অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে একত্ব ও অভিন্নতাজনক কোন কিছুই অস্তিত্বশীল থাকবে না যে, তখন পরিবর্তন ও গতিকে একটি একক বিষয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা যাবে।

৪. মানুষের সারসত্তায় গতি

এ পর্যন্ত আলোচনায় প্রমাণিত হল যে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অস্তিত্বশীলদের মধ্যে একটি গতি বিদ্যমান যা তাদের essence ও সত্তার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের সারসত্তা ও পরিচয়ে সেগুলোর পরিবর্তন ও নতুনত্ব বরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। এ গতি সাদরায়ী দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও গন্তব্যের অধিকারী এবং সমস্ত অস্তিত্বই এ গতির ভিত্তিতেই চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে গতিশীল। অস্তিত্বশীলদের মধ্যে মানুষ অন্যদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এ সত্তাগত গতির অধিকারী। অর্থাৎ অন্যান্য অস্তিত্বশীলের মত মানুষের যেমন রয়েছে উদ্ভিদ ও পশুত্বের মধ্য দিয়ে সাধারণ গতি, তদ্রূপ আরেকটি পৃথক ও ভিন্ন গতিরও সে অধিকারী, যা খুদীর (self) জন্যই নির্দ্দিষ্ট। (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৭৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩) এ গতি যদিও একান্ত প্রকৃতি থেকে শুরু হয়, তবে ক্রমান্বয়ে খুদীর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তরণ করে। ওস্তাদ শহীদ মুর্তাজা মোতাহ্হারী এ 'সারবস্তুগত গতি' (substancial motion)-কে এভাবে বিবৃত করেছেন :

'মানুষের ভ্রুণ হল একটি একান্ত প্রকৃতি। জগতের অন্যসব সাধারণ প্রকৃতির মতই একটি শতভাগ প্রাকৃতিক যৌগ। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে উক্ত প্রকৃতির সারবস্তুগত (substantial) আকৃতি ও শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ প্রকৃতি থেকেই ক্রমান্বয়ে

উৎপত্তি ঘটে খুদীর (self) এবং তা পরিণত হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেখানে খুদীতে পরিণত হয় (তাঁর বিশ্বাসে খুদী হল উৎপত্তিতে দেহগত, আর স্থায়িত্বে আত্মিক) সেখানে এরূপ নয় যে, একটি একান্ত জড়বস্তু এবং একটি অজড় সত্তা অস্তিত্বমান থাকবে; বরং তা একটি সংযুক্ত বাস্তবতাই (connected reality)। (মোতাহ্হারী, ১৩৭১, পৃ. ৬৬)

মানুষের মধ্যে গতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তা চেতনা ও ইচ্ছার ভিত্তিতে ঘটে। অবশ্য গতির উৎপত্তি সূত্র অন্যান্য অস্তিত্বশীলের ন্যায় ক্রোধ ও কামভাব থেকেও হতে পারে। কিন্তু এমনকি সেরূপ ক্ষেত্রেও চেতনা ও ইচ্ছার ভূমিকা থাকে। (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৭৮, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২২) এসব গতিই তার পরিণত ও পূর্ণতায় পৌঁছানোর উপায় নিশ্চিত করে এবং তার যে নির্বাচন ক্ষমতা রয়েছে তা দ্বারা চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে স্বীয় গতিপথের ধরন নির্ধারণ করে নেয়। এ ব্যাপারে মানবের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়, এমনভাবে যে, সে তার পরিবর্তন ও রূপান্তরের ক্ষেত্রকে অসীম পর্যন্ত বদলে ফেলতে পারে।

আর অধিকাংশ বিজ্ঞানী ও সকল দার্শনিক ধারণা করেছেন যে, মনুষ্য সারবস্তু সকলের মধ্যে একই এবং পার্থক্যহীন। তবে বিচক্ষণ বোদ্ধাদের নিকট এটি সঠিক নয়। কত মানুষই তো রয়েছে যারা পাশব খুদী নিয়ে বেঁচে আছে এবং এখনও মনের স্তরে পৌঁছতে পারেনি; আত্মা বা তার ওপরের বিষয় তো অনেক দূরের কথা। মানব সত্তার জন্য নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তর যেমন রয়েছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরও তেমনি রয়েছে। لهم درجات عند ر م -তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে স্তরসমূহ। এ স্তরসমূহ কারও জন্য রয়েছে নিছক সম্ভাবনার চাদরে মোড়ানো (potentially), আর কারও কারও জন্য রয়েছে ঘটিত বাস্তব (actually) রূপে। কারও জন্য অবরুদ্ধ, আর কারও জন্য অবমুক্ত। কেউ বা আছে যার স্থান হবে-

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ

'যারা আপনার হাতে বাইআত করে তারা তো কেবল আল্লাহর হাতে বাইআত করে...।'[৭] আর

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

'যে রাসূলকে আনুগত্য করে সে আল্লাহর আনুগত্য করল।'[৮]

এটাই হল একজন মানুষের সর্বশেষ মাকাম। আর এখান থেকেই বলেছে : من رأنى فقد رأى الحق অর্থাৎ 'যে আমাকে প্রত্যক্ষ করল সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করল।' আবার কেউ বা রয়েছে যার স্থান পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট :

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

'তারা হল পশুদের মত; বরং তার চেয়েও অধম।'[৯]

খুদীকে জানা এবং গন্তব্যের দিকে তার পর্যায়সমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া একটি বড় কাজ, যা পূর্ণাত্মা পুরুষদের ব্যতীত অন্য কারও ছাড়া সাধ্য নেই। (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৬৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

উপরোল্লিখিত চারটি শিরোনামের আলোচনা থেকে যা পাওয়া যায় সেটা হল : সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষ হল এমন এক সারসত্তার অধিকারী যা পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। যে পরিবর্তনের কারণে মানুষ essence বা সারসত্তার স্তর থেকে এবং পাশব সারবস্তু ও নিকৃষ্টতা থেকে সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ 'রব'-এর মাকামের নিকটে উন্নীত হতে পারে। এতমাত্রার পরিবর্তন কেবল সেই চৈতন্য ও নির্বাচনী (choice) স্বাধীনতার জন্যই স্বতন্ত্র (গুণ) যা মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং যা তাকে অপরাপর অস্তিত্বশীল প্রাণী থেকে পৃথক করে থাকে।

এ অংশ পর্যন্ত উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো প্রচলিত মতামতসমূহের মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু যে জিনিসটি পার্থক্যের বিষয় তা হল মরহুম সাদরার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এরূপ পরিবর্তন ও গতি দ্বারা মানুষের জন্য কোন সারসত্তাকে (essence) বিবেচনায় গ্রহণ করা যায় না।

উপরের বক্তব্যের ব্যাখ্যায় যাওয়ার পূর্বে ওস্তাদ শহীদ মোতাহ্হারীর আলোচনার খুঁটিনাটি দিকগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা দরকার। কেননা, এটি সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি ব্যাখ্যা। তিনি বিশ্বাস করেন যে, substantial motion বা সারবস্তুগত গতির ভিত্তিতে যেহেতু অস্তিত্বশীলদের মধ্যে সারসত্তা হল একটি পরিবর্তনশীল বিষয়, সেহেতু অস্তিত্বের সীমা-পরিধিকে সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করবে এরূপ বিশেষ ও নির্দিষ্ট কোন সারসত্তাকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে

সারসত্তাগত সীমা-পরিধি আনুমানিকভাবে ধরে নেওয়া হয়। একটি যানবাহনের মত, যা উদাহরণস্বরূপ দু-তিনটি শহরের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে চলাচল করে থাকে। এক্ষেত্রে যদিও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, যানবাহনটি ঠিক কোথায় অবস্থান করছে, কিন্তু তার আনুমানিক স্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। অস্তিত্বশীলদের ক্ষেত্রেও এরূপ করা হয়। একটি জিনিসের সারসত্তা যতই পরিবর্তন ও রূপান্তরের অবস্থায় থাক না কেন, কিন্তু বিশেষ একটি এলাকাকে তার পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টিতে নেওয়া হয় এবং সারসত্তাকে উক্ত এলাকার প্রতি ইশারাযোগ্য বলে ধরা হয়। কিন্তু কথা হল, এ ব্যাপারটি মানুষের ক্ষেত্রে কী রূপ? সেও কি অন্যান্য জিনিসের মত নির্দিষ্ট সীমার অধিকারী? প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের যে বিশেষ অবস্থা রয়েছে, তাতে তার জন্য বিশেষ কোন সীমা আরোপ করা ততটা সঠিক হবে না। কারণ, তার পরিবর্তন ও বিবর্তনের এলাকা এতটা বিস্তৃত যে, আসলে তার জন্য কোন সীমা এবং সে সূত্রে কোন সারসত্তা আরোপ করা যায় না। এ কারণে তিনি এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই একটি species তথা প্রজাতির অধিকারী। যদি মানুষ ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে এ কথা না বলি এবং তাদের universal essence তথা সামগ্রিক সারসত্তার জন্য কোন সারসত্তা আছে বলে ধরে নেই, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে (যার পরিবর্তন ও বিবর্তন এত বিস্তৃত পরিমাণে) এ কথা অবশ্যই বলতে হবে মানুষের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে একটি প্রজাতি (species) বলা উচিত। (মোতাহহারী, ১৩৬৯, পৃ. ৩৩৫)

সুতরাং সাদরায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের সারসত্তা (essence) কোন সার্বিক (universal) বিষয় নয়, যা সকলের মধ্যে অভিন্ন (common) ভাবে থাকবে। তার সারসত্তা, যা দার্শনিকদের বক্তব্য মতে তার অস্তিত্বের সীমারেখা নির্ধারণ করে থাকে, তা কখনই মানব প্রকৃতির সামষ্টিকতা নির্ধারণকারী নয়; বরং কেবল মানব সত্তার সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম মন্তব্য : পরস্পর আলাদা বিষয়াবলি

অস্তিত্ববাদে যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে একটি হল নির্বাচন তথা (choice)'র যে principle বা মূলনীতি, যা চূড়ান্ত পরিণামে একজন মানুষের সারসত্তা প্রদানের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি লাভ করে, তা অনস্বীকার্য ও মূল্যবান একটি বিষয়। এ নির্বাচনের ভিত্তিতে মানব শুধু স্বীয় reality তথা বাস্তব স্বরূপের অবশিষ্ট থেকে যাওয়া অংশকেই

প্রমাণিত করে। যেহেতু তার ভেতরকার সারসত্তা যা নাকচ হয়েছে, আর তার যা অবশিষ্ট থাকে সেটা হল তার অস্তিত্ব। সে তখনই অস্তিত্বশীল যখন সে নির্বাচনে (choice) হাত বাড়াবে। এ কারণে অনেকে, যেমন সোরেন কিয়ের্কেগার্দ ও জ্যাঁ পল সার্ত্রে মূলত অস্তিত্ব (existence) ও নির্বাচন (choice)-কে একই বলে মনে করেছেন। (কেভারী, ১৩৭৭, পৃ. ১৯৭) অন্যরাও এমনভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের অনেকেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূলভিত্তি কে নির্বাচনের প্রতি গুরুত্বারোপের ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁদের দৃষ্টিতে বাঁচার অর্থ হল নির্বাচন (choice)। (ম্যাথিউজ, ১৩৭৮, পৃ. ৯৯) এ দৃষ্টিতে খোদ পরিবর্তন ও পরিপূর্ণতাই হল মানুষের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এ দিকটিই হয়ত মানুষ ও তার reality সম্পর্কে পশ্চিমা চিন্তাধারার মূল ভিত গড়ে তুলেছে। যে জিনিসটি পাশ্চাত্য চিন্তধারায় বিশেষ করে অস্তিত্ববাদী দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল, মানুষ যেন নিজ রূপাকৃতির বেড়াজালে আটকে না থাকে, তাকে শৃঙ্খল ও বন্ধন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে হবে। পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়ে বন্দি থাকা গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ কখনই বাধ্যবাধকতার মধ্যে জীবন যাপন করে না। এ বিষয়টি জানার পর তার উচিত যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে নির্বাচন (choice) এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। যে বিষয়টি এসব অভিমতের মধ্যে অগ্রসর তা হল গতি ও পরিবর্তনকে মূল্যবান মনে করা। অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা থেকে পরিবর্তন এবং অতীত অবস্থা থেকে অতুষ্টি।

প্রতীয়মান হয় যে, (সাদরুল মুতাআল্লেহীনের রচিত) 'হিকমাতে মুতাআলিয়া'য় 'সারসত্তার পরিবর্তন ও রূপান্তরের মূলনীতিটি এককভাবে দৃষ্টিতে নেওয়া হয়নি। এই যে মানুষের সৃষ্টির অবিরাম গতির ভিত্তি অনুসারে পরিবর্তন লাভ করতে হবে এবং নিজের বিরাজমান অবস্থাকে বদলাতে হবে, এটি সাদরুল মুতাআল্লেহীনেরও স্বীকৃত কথা। কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে, এ কথাটি দ্বারা তিনি যা বলতে চান, তা সম্পূর্ণ ধারণ করতে পারে না। সকল অস্তিত্বশীল সত্তা, যার মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত হয়,তা substantial motion বা সারবস্তুগত গতির ভিত্তিতে পরিবর্তিত জিনিস বলেই ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু সে পরিবর্তন না, যেখানে শুধু পরিবর্তনেই ক্ষান্ত থাকে। সাদরার দৃষ্টিতে যে পরিবর্তনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তার অর্থ হল পূর্ণতার দিকে যাত্রা। এটি হল জগতের সৃষ্টিগত যাত্রার গতিপথ যা পূর্ণতা ও উৎকর্ষের দিকে চলে। এক্ষেত্রে মানুষ উক্ত গতি ছাড়াও আরেকটি সত্তাগত গতির অধিকারী যা স্বীয় অস্তিত্বের সারবস্তুকে গন্তব্যের মঞ্জিলে পৌঁছাতে পারে। এটিই হল খোদায়ী মিলন। আবার

একে নিকৃষ্টতম উপায়ে অধঃপতিতও করা যায়। মানুষ এ পথে, যা শরীয়তের পথ এবং নবিগণের দাওয়াতের পথও বটে, নিজের আত্মগত গুণ বা ধর্মকে নির্ধারণ করে এবং নিজের সারসত্তা ও সারবস্তুকে নির্বাচন (choice) করে : 'তুমি জানলে যে, প্রত্যেক অস্তিত্বশীলের একটি সত্তাগত ও স্বাভাবিক গতি এবং আদি কারণের প্রতি এক সহজাত মনোযোগ রয়েছে। মানুষের জন্য এ সর্বজনীন সারবস্তুগত গতি ছাড়াও অন্য আরেকটি সত্তাগত গতি রয়েছে যার উৎস হল মানুষের খুদীর গুণ তথা ধর্মে আপতিত (accidental) সেই গতি, যা দীনের প্রতি তাকে প্রবৃত্ত করে। আর সেটি হল একত্ববাদের পথে চলা এবং আম্বিয়া, আউলিয়া ও তাঁদের অনুসারীদের পথে চলা।' (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৭৮, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)

যেমনটা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের ব্যাখ্যায় প্রথমত সকল অস্তিত্বই স্বীয় সৃষ্টির কক্ষপথে অস্তিত্ব জগতের সূচনামূলের অভিমুখে গতিশীল। দ্বিতীয়ত মানুষ এ গতির পাশাপাশি স্বীয় সারসত্তা নির্ধারণের স্বাধীনতা ও নিজ গতির দিক নির্বাচনের ক্ষমতারও অধিকারী। এ স্বাধীনতা দ্বারা সে সৃষ্টিমূলের অভিমুখে তার গতিপথকে উত্থান অথবা পতনের দিকে নির্ধারণ করবে কিনা, তা নির্দিষ্ট করতে পারে।

আমরা যদি মানুষের জন্য substantial motion এবং ঊর্ধ্বগতি বা অধঃগতি নির্ধারণকে দৃষ্টিতে রাখি এবং কোন একভাবে গতি ও পরিবর্তনের জন্য মূল্য আরোপ করি, তাহলে এর সাথে অস্তিত্ববাদের নিছক choice বা নির্বাচন কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দেয়। অবশ্য উন্নত ও পূর্ণতার কথা কোন কোন অস্তিত্ববাদীর লেখনীতে পাওয়া যায় বটে। তাঁদের কথায় এ গতিযাত্রার উল্লেখ রয়েছে এবং মানুষ যেভাবে choice করে সে অনুসারেই উন্নতি বা পতনের পথে অগ্রসর হয়।

এ মর্মে ইয়াসপের্স বিশ্বাস করেন, 'মানুষ কখনই সম্পূর্ণ নয়; বরং সর্বদা হয় পূর্ণতার পথে চলমান নতুবা অধঃপতনের দিকে চলমান।' (নাস্‌র, ১৩৭৫, পৃ. ৫৮) যেমনটা এ নিবন্ধের প্রথমভাগে নীট্‌শের বক্তব্যে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তিনি মানুষের উচ্চতর পর্যায়সমূহে পৌঁছানোর সম্পর্কে কথা বলেন। (কোলেনবার্গার, ১৩৮৪, পৃ. ১১৩) কিন্তু কথা হল, এই যে উৎকর্ষ, যার কথা প্রত্যেক দার্শনিক স্ব স্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিকোণ থেকে লালন ও ব্যাখ্যা করে থাকেন, তা সারবস্তু (substance) ও সারসত্তার (essence) ক্ষেত্রে বলা হয়নি। বরং অস্তিত্বের (existence) সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এ ব্যাপারটি হয়ত পূর্ণ আরোহ (induction) পদ্ধতিতে হয়নি। তবে

প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু অস্তিত্ববাদী দর্শনে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অস্তিত্বের ওপর সেহেতু মানুষের সারসত্তা মানব জীবনে ততটা প্রভাবশালী বলে গণ্য করা হয়নি। এ কারণে এই যে সাদরায়ী 'সারবস্তুগত গতি'র মধ্যে আমরা একটি উন্নত বিষয়ের দিকে এবং পরাপ্রাকৃতিক শক্তির দিকে মানুষের সারসত্তার পরিবর্তন ও বিবর্তনের ইশারা পাই, এটি অস্তিত্ববাদী দর্শনে গুরুত্ব পায়নি।

আরেকটি পৃথক বিষয় যা অস্তিত্ববাদী দার্শনকিদের কথায় পরিদৃষ্ট হয় না, তাহল : সাদরায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি মানুষের সারসত্তা universal (সামগ্রিক) বলে স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু মানুষের জন্য সারসত্তার অস্তিত্বের মূলনীতি স্বীকৃত হয়েছে– যা প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের সারসত্তা universal, তবে পরিবর্তিত বলে স্বীকার করা হয়েছে। অন্য কথায়, এটি বলা যায় না যে, মানুষের আদতেই সারসত্তা নেই। কেননা, দার্শনিকদের কাছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তার ভিত্তিতে বিশ্বের বহিঃজগতে পবিত্র আবশ্যিক অস্তিত্বসত্তা ব্যতীত প্রত্যেক (সম্ভাব্য) অস্তিত্বেরই সারসত্তা রয়েছে। অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের কথাবার্তায় বিশেষ করে সার্ত্রের 'মানুষ প্রথমে nothing'- এ কথায় যে বলা হয়েছে মানুষের সারসত্তা নেই এবং খোদ সারসত্তা নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করে– কথাটি এক প্রকার অতিরঞ্জন। এটি কিভাবে সম্ভব যে, একটি অস্তিত্বকে অন্যান্য অস্তিত্ব থেকে পৃথক জানব, তার সম্পর্কে কিছু ব্যক্ত করব, তার দিকে ইশারা করব ও কল্পণাযোগ্য ও উপলব্ধিযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ তার জন্য আরোপ করব, অথচ তার জন্য কোন সারসত্তা আরোপ করা যাবে না? এটি এমন প্রশ্ন যা থেকে অন্যান্য অস্তিত্বশীলের মত মানুষেরও সারসত্তাসম্পন্ন হওয়ার কারণ ঘটে। তবে সারসত্তার অধিকারী হওয়ার অর্থ এটি নয় যে, সে অন্যদের সাথে যৌথভাবে (commonly) বিবেচ্য হবে কিম্বা নিজ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে আবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ থাকতে পারবে না; বরং সে একদিকে যেমন নিজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ক্ষমতার অধিকারী, অপরদিকে তেমনি সেই সারসত্তাও তার রয়েছে যার মাধ্যমে তার অস্তিত্বগত বাস্তবতা (existential reality) সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

দ্বিতীয় মন্তব্য : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ (individualism)

অস্তিত্ববাদী দর্শনে অপর যে বিষয়ে অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে তা হল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ। এ বিষয়টি এ মতবাদের একটি সূচক বা নির্দেশক বলে গণ্য হয়।

(গীয়াছি, ১৩৭৫, পৃ. ৭) কিয়ের্কেগার্দ ও ইয়াসপের্স এর ন্যায় অস্তিত্ববাদীরা এ প্রসঙ্গে মানুষকে একক ও একা বলে জানেন। তাঁরা মৌল অস্তিত্বকে ব্যক্তির (individual) অধিকারে বলে মনে করেন এমনভাবে যে, মানুষ যদি স্বীয় চিন্তা ও আচরণকে 'জনগণের একজন'-এর মত কিম্বা সমাজের একজন সদস্যের মত ধরে নেয়, তাহলে মৌল অস্তিত্ব থেকে দূরে সরে যাবে। (নাস্‌র, ১৩৭৫, পৃ. ৫২)

সার্ত্রে এ ব্যাপারে আরও কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছেন। যদিও বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষ ভাগে এ অবস্থান থেকে সরে আসেন, কিন্তু তাঁর মতবাদ প্রচারের তুঙ্গে যখন, সে সময়ে অন্যদের সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগকে একটি ঘৃণ্য বিষয় হিসাবে প্রকাশ করেন এবং বলেন : 'নরক হল অন্যদের উপস্থিতি।' (ম্যাক কেভারী, ১৩৭৭, পৃ. ১০)

মরহুম সাদরুল মুতাআল্লেহীনের চিন্তায় আমরা মানব ব্যক্তির প্রতি এক প্রকার বিশেষ মনোযোগের সন্ধান পাই। ব্যক্তিই হল সে যে নিজের স্বতন্ত্র মনুষ্যত্বের অধিকারী। ব্যক্তি হল সে যার সারসত্তা সকলের সারসত্তা থেকে ভিন্ন হতে পারে। ব্যক্তি হল সে, যার সত্তা এবং উক্ত সত্তার অনুগামী সকল তৎপরতা ও নিশ্চলতা পূর্ব থেকে নির্ধারণকৃত নয়। সে সামগ্রিকের ও নির্দিষ্টের অংশ নয়। Substantial motion তথা সারবস্তুড়শ গতি সম্পর্কিত তাঁর তত্ত্বের ঘোষণা অনুযায়ী : 'রহিমের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব বিদ্যমান, করিমের মধ্যে তা নেই। কাজেই রহিম ও করিম থেকে যে মনুষ্যত্ব পাওয়া যায়, সেটা যেহেতু তাদের দু'জনের থেকে প্রাপ্ত, কাজেই ঠিক সেটাই নয় যা প্রত্যেকের মধ্যে এককভাবে বিদ্যমান।' (সাদরুল মুতাআল্লেহীন, ১৩৭৮, পৃ. ৩৬৪)

মানুষের প্রতি এই যে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে সে স্বাধীনরূপে এবং অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে নিজের অভ্যন্তরীণ essence ও substance কে নির্ধারণ করে, এতে তা মানুষের জন্য বিশেষ কর্তব্যও বয়ে আনে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ অনুভব করে যে, কতুটুকু সে তার আজ ও আগামীকালের ভাগ্যের ওপর ভূমিকার অধিকারী থাকতে পারবে। শহীদ মোতাহ্‌হারীর ভাষায়, সে যে দক্ষতা অর্জন করে তা দ্বারা সে নিজের existential reality (অস্তিত্বগত স্বরূপ)-কে বাস্তবে রূপদান করতে পারে। সে যে নির্বাচন করে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের মতানুসারে তা দ্বারা সে কেবল কতিপয় আপতিত (accidental) বিষয় ও আপতিত গুণ বা ধর্মকেই তার অস্তিত্বের

ওপর সৃষ্টি করে না; বরং বিভিন্ন সক্ষমতা (faculty) অর্জনের নিমিত্ত স্বীয় বাস্তব স্বরূপকে পরিবর্তিত করতে পারে। (মোতাহ্হারী, ১৩৬৩, পৃ. ৩৪৯)

এ কর্তব্যভার মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্রেক করে যা আলাদাভাবে প্রত্যেক (individually) মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। প্রতীয়মান হয় যে, ঐশীবাণীতেও যখন কর্তব্যের কথা বলা হয়, তখন বেশি বেশি ব্যক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঐশীবাণীতে উপর্যুপরি এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় যে, মানুষ কিয়ামতে একাকী পুনরুত্থিত হবে। (সূরা আনআম : ৯৪, সূরা মারইয়াম : ৮০ ও ৯৫, সূরা বনি ইসরাইল : ১৪)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, সাদরায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ যদিও নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ এবং সে নিজেই নিজের স্বাধীন সারসত্তা গঠন করে, তবে অন্যরা পারে মানুষের সারসত্তার উৎকর্ষে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য বাঞ্ছিত উৎসমূল হিসাবে গণ্য হতে। কখনো বিষয়টি এরূপ নয় যে, অন্যান্য মানুষ সারবস্তুগতভাবে উদ্দেশ্যে পৌছানোর পথে এক প্রকার বাধা বলে পরিগণিত হবে। এ সম্পর্কে মরহুম সাদরুল মুতাআল্লেহীনের 'আসফারে আরবাআ'র চতুর্থ সিফ্রে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামতের প্রতি ইশারা করা যায়। তিনি 'আসফার'-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে, ইরফান হল চারটি সফর সম্বলিত একটি আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণ। প্রথম : সাধকের সৃষ্টি থেকে সত্যের (স্রষ্টার) দিকে সফর। দ্বিতীয় : সাধকের সত্য থেকে সত্যের দিকে সত্যের দ্বারা সফর। তৃতীয় : সাধকের সত্য থেকে সৃষ্টির প্রতি সত্যের দ্বারা সফর। চতুর্থ : সৃষ্টি থেকে সত্যের দিকে সত্য দ্বারা সফর।

চতুর্থ সফরটি, যা পূর্ণাত্মা মানবের মরমী আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ নির্দেশ করে, এ পর্যায়ে সাধক সৃষ্টিকুল ও তাদের নিদর্শনাদি ও চাহিদা-অনুষঙ্গ সমূহকে প্রত্যক্ষ করে এবং তাদের উপস্থিত ও ভবিষ্যতের (অর্থাৎ দুনিয়া ও পরকালের) লাভ-ক্ষতির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং অনুরূপভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের প্রত্যাবর্তন ও সে প্রত্যাবর্তনের ধরন-পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানের আসল বাস্তবতায় পৌঁছে যায়। সে এ পর্যায়ে তাশরীয়ী নবুওয়াত অর্থে নবী হয়ে যায় এবং 'নবী' নামেও আখ্যায়িত হয়। কেননা, সে সৃষ্টিকুলের অবশিষ্টি সম্পর্কে এবং তাদের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে, আর তাদের দুর্ভাগ্য কিসের মধ্যে সে ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করে। আর এ সবই হয় স্রষ্টার মাধ্যমে। যেহেতু তার অস্তিত্ব হল সত্যনিষ্ঠ এবং এসবের দিকে

মনোযোগ তাকে স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ থেকে বিরত রাখে না।... (নাস্‌র, ১৩৮২, পৃ. ৯৮)

সাদরুল মুতাআল্লেহীন কর্তৃক বিভিন্ন সফরে যে গুরুত্বারোপ করেছেন তা থেকে সহজ যে ফলাফল হাতে আসে তা হল : মানুষ যদি মহাপ্রতিপালকের সত্তা থেকে স্বীয় মনোযোগকে ফিরিয়ে না নেয় তাহলে জগতের সৃষ্টিকুল বিশেষ করে অপরাপর মানুষ মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত অবদানের উৎস হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এমনকি তার পরম গন্তব্য অভিমুখে ঊর্ধ্বারোহণের পথে চূড়ান্ত পর্যায়সমূহেও উপকারী হতে পারে। এ কারণে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিতে কিয়ের্কেগার্ড ও সার্তের ন্যায় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে তেমন 'না-ইতিবাচক' দৃষ্টি থেকে তার সম্মুখীন হই এবং সেখানে মানুষ হয় পূর্ণতা ও উৎকর্ষের পথে বাধা, আর না হয় এক প্রকার নেতিবাচক ব্যাপার অথবা কমপক্ষে মূল্যহীন ব্যাপার হিসাবে পরিগণিত হয়– তা থেকে বিমুক্ত। আরও ভালভাবে বলা যায় যে, সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিগত (individual) সত্তার প্রতি মনোযোগ তার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও অন্যদের থেকে দূরত্ব ও বিরহ কিম্বা আত্মমুখিতা অবলম্বন নয়; বরং তার গুরুত্বারোপ হল এর ওপর যে, মানুষের উচিত তার কর্তব্যকে (অর্থাৎ উচ্চতর অস্তিত্বের প্রতি স্বীয় সারবস্তুক ও সারসত্তাগত গতিকে প্রগতিশীল করা) শুধু নিজের কাঁধেই বহন করা। নিজের খুদীর গতি ও বিবর্তন-পরিবর্তনের দায়িত্ব একমাত্র তারই, অন্যের নয়।

সিদ্ধান্ত ও ফলাফল

অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিতে মানুষের সারসত্তা (essence) নেই। সারসত্তাকে একটি ব্যক্তিগত (individual) বিষয় এবং সে স্বাধীনতা ও নির্বাচন (choice) এর মাধ্যমে নিজেই তাকে পরম রূপ দান করে। প্রচলিত ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে মানুষ হল সারসত্তা (essence) ও বাস্তব স্বরূপ (reality) এর অধিকারী, কুরআনের পরিভাষায় যাকে বলা হয়েছে ফিতরাত বা সহজাত প্রবৃত্তি এবং যা সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। অবশ্য এ সারসত্তা মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ও বিবর্তনযোগ্য এবং মানুষের মধ্যে এর প্রভাব পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে যাওয়া সম্ভব। এ উভয় মতবাদের বিপরীতে মরহুম সাদরা মানুষের মধ্যে সার্বিক (universal) ভাবে কোন সারসত্তা নেই বলে মনে

করেন; বরং তিনি মানুষের সারসত্তাকে ব্যক্তিড়ত বলে গ্রহণ করেন। মানুষ substantial motion তথা সারবস্তুগত গতি দ্বারা স্বীয় সারসত্তাকে ব্যাপক পরিসরে পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং নিজের গতিকে ঊর্ধ্ব কিম্বা অধঃ– এ দুয়ের মধ্যে নির্ধারণ করতে পারে। সাদরায়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল গতি গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং গতির দিক ও অভিমুখই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। অন্য কথায়, আমরা মানুষের গতির মূল্য আরোপের (কাজের) সম্মুখীন এবং পরিবর্তন ও রূপান্তরের যে ভিত্তি অস্তিত্ববাদী দর্শনে গুরুত্ব পেয়েছে, তা কোন সমস্যার সমাধান করে না। আরেকটি কথা হল, ব্যক্তি পর্যায়, যা মরহুম সাদরার তাগিদের বিষয়ও বটে, তার অর্থ হল মানুষের স্বীয় খুদীর পরিবর্তনের কর্তব্য নিজের ওপর সীমাবদ্ধ করা; অস্তিত্ববাদে বিদ্যমান কোণঠাসা ভাব ও কুধারণা অর্থে নয় যার প্রতি অনেক অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদ গুরুত্বারোপ করে এসেছেন।

অনুবাদ : আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Existentialism বা অস্তিত্ববাদ হল এমন একটি দার্শনিক মতবাদ যা আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বে বরং একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম বলেই বেশি পরিচিত। যা ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করে। তবে সাধারণ অর্থে নয়, বিশেষ অর্থে; বিমূর্ত, কাল্পনিক বা বস্তুগত ধারণা হিসাবে নয়, মূর্ত ও বাস্তব ধারণা হিসাবে; অর্থাৎ অস্তিত্ব যেভাবে বাস্তবে কোন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রকাশিত হয়, সেভাবে। এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎপত্তি। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারে মানুষ হয়েছে ধন্য, কিন্তু তার সঙ্গে হারিয়েছে নিজেকে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে, স্বাধীনতাকে। প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভুত্ব বিস্তার করেছে মানুষের ওপর। মানুষ হয়েছে যন্ত্রের ক্রীতদাস। এ সভ্যতার চাপে মানুষ শুধু নিজেকে ভুলে গেছে তা নয়, তার জীবনে এসেছে এক বিরাট শূন্যতা। শিল্প ও যন্ত্রের তাণ্ডবের সামনে আজ সে অসহায়। তার যেন কোন স্বাধীনতা নেই । নেই কোন মর্যাদা। যন্ত্রের উপরই যেন তার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আধুনিক সমাজে সে কেবল একজন করদাতা প্রজা ও ভোটার। এর বেশি কোন পরিচয় তার নেই। তার ওপর যন্ত্রের এ প্রভুত্ব যে কত ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে মাত্র পঁচিশ বছর ব্যবধানে সংঘটিত দু দু'টি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা তার প্রমাণ। মহাযুদ্ধের এসব বিভীষিকাময় তাণ্ডবলীলা অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের মনে

নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, যার ফলস্বরূপ তাঁরা ঘোষণা করেছেন তাঁদের বিপ্লবী দর্শন, যে দর্শন মূল্য দেয় ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে, তার ব্যক্তিসত্তা ও মূল্যবোধকে। মানুষ যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হবে না; বরং সে যন্ত্রের ওপর প্রভুত্ব করবে। অস্তিত্ববাদই একমাত্র মতবাদ যা মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় অতি বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। অস্তিত্ববাদ ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার এক বলিষ্ঠ দার্শনিক প্রচেষ্টা। আসলে অস্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা, স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রতি অবহেলার প্রতিবাদস্বরূপই জন্ম নিয়েছে এ মতবাদ।-অনুবাদক

২. এখানে উদ্দেশ্য বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষের জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট এমন কিছু নেই যা তাকে অবশ্যই হতে হবে, নির্দিষ্ট এমন কোন নিয়ম নেই যা তাকে মানতেই হবে বা এমন কোন নির্দিষ্ট নমুনা নেই যার সঙ্গে তার জীবনকে সঙ্গতিপূর্ণ হতেই হবে।– অনুবাদক

৩. অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ তার স্বাধীন চিন্তা ও নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের ধারায় জীবন-যাপন করে, তার জীবনকে মূল্যবান বা মূল্যহীন করে, তাৎপর্যময় বা তুচ্ছ বলে গণ্য করে। একটি স্বাধীন জীব হিসাবে মানুষ নিজের অদৃষ্টকে বেছে নেয়, জিনিসের ওপর মূল্য নির্ধারণ করে, নিজের স্বভাবকে তৈরি করে এবং নিজের নৈতিক মানদণ্ড সৃষ্টি করে।– অনুবাদক

৪. Jean-Paul Sartre : 1905-1980

৫. Friedrich Wilhelm Nietzsche : 1844-1900

৬. Martin Heidegger : 1889-1976

৭. সূরা ফাত্হ : ১০

৮. সূরা নিসা : ৮০

৯. সূরা আরাফ : ১৭৯

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত।)